Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ মানবতার শত্রু কেন?

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দিন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আরেফিন নাহার

রোলঃ 21500229216

২৬ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ মানবতার শত্রু কেন?

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দিন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আরেফিন নাহার
রোলঃ 21500229216

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ মানবতার শত্রু কেন?" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আরেফিন নাহার, আইডিঃ 21500229216 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দিন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ মানবতার শত্রু কেন? " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দিন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Arefin Nahar

(স্বাক্ষর)

মাও: সাইফুদ্দিন শাকিল

আইডিঃ 21500229216

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২৬ মে, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

ট্রান্সজেন্ডারবাদ কি?

অবিশ্বাস্য রকমের দ্রুত গতিতে পশ্চিমা বিশ্বের ওপর রাজত্ব কায়েম করেছে অদ্ভুত এক মতবাদ। এ মতবাদের নাম 'ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ' (Transgenderism) বা রূপান্তরকামিতা। অনেকে একে 'জেন্ডার আইডেন্টিটি' বা 'লিঙ্গ-পরিচয়-মতবাদ' বলেও অবিহিত করে থাকেন।

এই মতবাদ বলে, কোনো পুরুষের যদি 'নিজেকে নারী বলে মনে হয়', তাহলে সে একজন নারী। সমাজ ও আইন নারী হিসেবেই তাকে বিবেচনা করবে। চাই সেই পুরুষ শারীরিকভাবে পুরোপুরি স্বাভাবিক হোক, বা তিন বাচ্চার বাপ হোক, তাতে কিছুই আসে যায় না।

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ বলে, কোনো নারীর নিজেকে যদি পুরুষ মনে হয়, তাহলে সে পুরুষ। যদিও তার মাসিক হয়, সে গর্ভবতী হয়, শারীরিকভাবে সে হয় ১০০% সুস্থ। নিজেকে পুরুষ মনে করা নারী যদি সন্তানের জন্ম দেয়, তাহলে সেটা ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের ভ্রান্তির প্রমাণ না; বরং ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের চোখে এটাই প্রমাণ করে যে, 'পুরুষও সন্তান জন্ম দিতে পারে।'

এই মতবাদ অনুযায়ী কোনো বালকের যদি 'মনে হয়' সে বালিকা, অথবা কোনো বালিকার যদি মনে হয় সে বালক, তাহলে এই 'মনে হওয়া'-এর ভিত্তিতে সেই বালক কিংবা বালিকাকে চাহিবামাত্র হরমোন ট্রিটমেন্ট এবং বিভিন্ন অপারেশনের মাধ্যমে কাটাকুটি করে নিজের শরীরকে বদলে ফেলার 'অধিকার' দিতে হবে। তার এই 'মনে হওয়া'-এর

চিকিৎসা করা যাবে না, বরং বদলে দিতে হবে শরীরকে।

মতবাদটির প্রভাবশালী এক প্রচারক সংস্থার ভাষায়—

Transgender is a term used to describe people whose gender identity differs from the sex they were assigned at birth. Gender identity is a person's internal, personal sense of being a man or a woman (or boy or girl.) For some people, their gender identity does not fit neatly into those two choices. For transgender people, the sex they were assigned at birth and their own internal gender identity do not match. ...

As part of the transition process, many transgender people are prescribed hormones by their doctors to change their bodies. Some undergo surgeries as well. But not all transgender people can or will take those steps, and it's important to know that being transgender is not dependent upon medical procedures.

অর্থ : ট্রান্সজেন্ডার একটি পরিভাষা। যার দ্বারা এমন লোকদের বোঝানো হয়, যাদের লিঙ্গ পরিচয় তাদের জন্মের সময় নির্ধারণ হওয়া লিঙ্গ পরিচয় থেকে ভিন্ন। লিঙ্গ পরিচয় হল, সে কি পুরুষ, না নারী—এ ব্যাপারে তার মানসিক বোধ। আর এই শ্রেণির মানুষের সেই মানসিক বোধ তার জন্মের সময় যে লিঙ্গ পরিচয় নির্ধারণ হয়েছিল এর থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে। ...আর কিছু কিছু ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তি হরমোন থেরাপি গ্রহণ করে থাকে, আবার তাদের কেউ সার্জারিও করে। তবে সব ট্রান্সজেন্ডার এগুলো করে না বা করতে পারে না। এবং এটি জেনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, লিঙ্গ পরিচয় পরিবর্তন করে ট্রান্সজেন্ডার হওয়া—কোনো চিকিৎসাব্যবস্থা গ্রহণের ওপর নির্ভরশীল নয়।

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ তার অবস্থানকে ব্যাখ্যা করার জন্য চারটা ধারণাকে ব্যবহার করে-

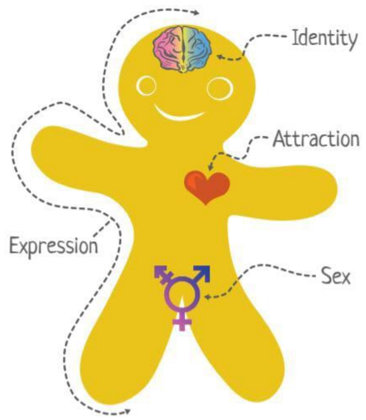
* বায়োলজিকাল সেক্স (Biological Sex) বা জন্মগত লিঙ্গ

* সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন (Sexual Orientation) বা প্রণয়বোধ ও যৌন আকর্ষণ

*জেন্ডার

* জেন্ডার আইডেন্টিটি (Gender Identity) বা মনস্তাত্ত্বিক লিঙ্গবোধ/মনের লিঙ্গ)।

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ বলে, এই চারটি জিনিস আলাদা। তারা কীভাবে এ চারটিকে সংজ্ঞায়িত করে, সেটি সংক্ষেপে জেনে নেওয়া যাক। তারা বলে-



বায়োলজিকাল সেক্স বা জন্মগত লিঙ্গ হলো স্রেফ দেহের বর্ণনা। মানুষের জন্মগত বৈশিষ্ট্য, যেমন: ক্রোমোসোম, যৌনাঙ্গ, হরমোন ইত্যাদি মিলে তার জন্মগত লিঙ্গ ঠিক হয়। কিছু মানুষের পুরুষাঙ্গ থাকে, কিছু মানুষের যোনি থাকে। কিন্তু এগুলো দিয়ে বা দেহ দিয়ে মানুষের পরিচয় ঠিক হয় না।

সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন হলো মানুষের যৌন রুচি বা আকর্ষণ। যৌন আকর্ষণ বিভিন্ন রকমের হতে পারে। এক্ষেত্রে ভালোমন্দ, ভুল কিংবা সঠিক বলে কিছু নেই। কেউ

বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে, কেউ সমলিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে, কেউ আকৃষ্ট হতে পারে উভয়ের প্রতি। আবার কারও মধ্যে হয়তো যৌনতার কোনো আকাঙ্ক্ষাই নেই। যৌন রুচি একটা বর্ণালির মতো। এখানে আছে অনেক রং। পুরুষ হলেই নারীর প্রতি বা নারী হলেই পুরুষের প্রতি আকর্ষণবোধ করতে হবে, এমন কোনো কথা নেই।

জেন্ডার হলো নারী বা পুরুষ হওয়ার সাথে যুক্ত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রত্যাশা। সমাজ ও সংস্কৃতি নারীর কাছ থেকে বিশেষ কিছু আচরণ আশা করে, আর আলাদা ধরনের আচরণ প্রত্যাশা করে পুরুষের কাছ থেকে। নারী ও পুরুষের কেমন হওয়া উচিত, এ ব্যাপারে সমাজের নির্দিষ্ট কিছু ধারণা থাকে; কিন্তু এই ধারণা আর দৃষ্টিভঙ্গিগুলো মানুষের বানানো। সর্বজনীন কিছু না।

জেন্ডারও আসলে একটি বর্ণালির মতো। নারী বা পুরুষ হওয়ার নির্দিষ্ট কোনো পথ নেই। কেউ নিজেকে নারী ও পুরুষ, দুটোই বা কোনোটাই না অথবা এ দুয়ের মাঝামাঝি কোনো কিছু হিসেবেও পরিচয় দিতে পারে। এক্ষেত্রে সবই সমান, সবই বৈধ।

জেন্ডার আইডেন্টিটি বা মনস্তাত্ত্বিক লিঙ্গবোধ হলো নিজের ব্যাপারে মানুষের অনুভূতি। কারও দেহ পুরুষের হতে পারে, কিন্তু সে নিজেকে নারী মনে করে এবং নিজেকে নারী হিসেবে প্রকাশ করে। সে নারীসুলভ নাম ব্যবহার করে, পোশাক পরে ইত্যাদি। নিজেকে নারী মনে হওয়াটা হলো মনস্তাত্ত্বিক লিঙ্গবোধ বা জেন্ডার আইডেন্টিটি। আর নিজেকে

নারী হিসেবে প্রকাশ করাটা হলো জেন্ডার এক্সপ্রেশন (Gender Expression) বা মনের লিঙ্গের বহিঃপ্রকাশ।

একজন মানুষ নিজেকে যা মনে করে, সমাজ ও আইন তাকে সেটাই গণ্য করবে। অর্থাৎ জন্মগত লিঙ্গের ওপর মনস্তাত্ত্বিক লিঙ্গবোধ প্রাধান্য পাবে। তাই পুরুষাঙ্গ থাকলেও কেউ 'নারী' হতে পারে, যোনি থাকলেও কেউ পুরুষ হতে পারে। এই চারটি ধারণা কীভাবে কাজ করে এবং কীভাবে এগুলোর মাধ্যমে মানুষের পরিচয় তৈরি হয়, সেটা বোঝানোর জন্য বিভিন্ন ছবি ব্যবহার করা হয়। তেমনি একটি ছবি নিচে যুক্ত করা হলো-

ট্রান্সজেন্ডার মতবাদের সূচনা

মূলত **১৯৯০** সালের পর থেকে ট্রান্সজেন্ডার তথা জেন্ডার আইডেন্টিটি শব্দটি একটি গোষ্ঠী বা আম্ব্রেলা টার্ম হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এটা নন-বাইনারি ও এলজিবিটি-এর সমার্থক শব্দ। **১৯৬৫** সালে কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির সাইক্রিয়াটিস্ট প্রফেসর John F. Oliven ট্রান্সজেন্ডার শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। এটা (Transsexualismus) জার্মান শব্দ হিসেবে **১৯২৩** সালে প্রথম প্রবর্তন হয়। এরপর এই শব্দের বিবর্তন ঘটে Transsexual হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত ছিল। শুরুর দিকে ট্রান্সজেন্ডার বলতে যারা লিঙ্গ পরিবর্তন করতে হরমোন ও সার্জারির আশ্রয় নিত, তাদেরকে বোঝানো হত। ট্রান্সজেন্ডারের সংজ্ঞা এখন অনেক ব্যাপক; এমনকি যারা ক্রসড্রেসার (যারা বিপরীত লিঙ্গের পোশাক ও বেশভূষা গ্রহণকারী অর্থাৎ ছেলে যদি মেয়েদের ড্রেস পরতে আকর্ষিত হয়)।

এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, এটা বর্তমানে বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য বা মেডিক্যাল প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভর করে না; মনের ইচ্ছাধীন বিষয়। অর্থাৎ যে কেউ যে কোনো সময় নিজেকে ট্রান্সজেন্ডার ঘোষণা দিতে পারে। যেদিন থেকে কারো মনে হয় যে, সে জন্মগত লিঙ্গ পরিচয়ে আগ্রহী বা বিশ্বাসী নয়, সেদিন থেকে নিজেকে ট্রান্সজেন্ডার হিসেবে পরিচয় দিতে পারে।

জেন্ডার রাজনীতি

জন মানি (১৯২১-২০০৬ খ্রি.)। বিকৃত চিন্তার নিউজিল্যান্ড-আমেরিকান সাইকোলোজিস্ট, জন হপকিন্স ইউনিভার্সিটির প্রফেসর। অভিশপ্ত 'জেন্ডার ধারণার' অগ্রদূত। যার হাত ধরে শুরু হয় জেন্ডার ও লিঙ্গকে আলাদা ভাবার মিথ্যার জগত। 'জেন্ডার রোল' এবং 'সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন'-এর মতো চিন্তার প্রবক্তা; যেখান থেকে শুরু হয় সমকামিতা ও অজাচারকে 'সায়েন্টিফিক্যালি প্রুভড' বানানোর প্রক্রিয়া। ক্লিনিক্যাল ডক্টর না হয়েও লিঙ্গ পরিবর্তনের সর্বপ্রথম 'এক্সপেরিমেন্টাল সার্জারি' হয় জন মানির হাত ধরে। জন মানি তার সমগ্র জীবন ব্যয় করেছে এসব নরমালাইজেশনের পিছনে। বর্তমান ট্রান্সজেন্ডারিজম ও এলজিবিটিকিউ ফিতনার বৃহদাংশ দাঁড়িয়ে আছে জন মানির চিন্তা ও বিকৃত এক্সপেরিমেন্টের ওপর। জন মানির ফিতনার পূর্বসূরি হলো সিমোন ডি বোভোয়ার। নতুন নতুন থিওরি ও এক্সপেরিমেন্ট জোরালোভাবে বাস্তবায়ন করে জন মানি; পরবতীতে 'পূর্ণতা' দেয় আলফ্রেড কিনসি। -সম্পাদক

যখনই আপনি 'জেন্ডার' শব্দটি শুনবেন, বা দেখবেন যে জেন্ডার ও সেক্সকে আলাদা কিছু হিসেবে বলা হচ্ছে, বুঝবেন যে এটা জঘন্য মানুষদের বানানো কিছু টার্ম। এদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো তস্কর ও যৌনবিকৃত মানুষ হলো জন মানি। এ-প্রসঙ্গে লেখা অন্যতম বই হলো, "The Man Who Invented Gender"।

এই জঘন্য মিথ্যাকে ছড়িয়ে দিতে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা রাখে জাতিসংঘ ও এর শাখাগুলো-বিশেষ করে WHO বা বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা। 'জেন্ডার' শব্দটি! ১৯৯৪ সালে কায়রোতে জাতিসংঘের জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ক সম্মেলনের প্রতিবেদনে এবং ১৯৯৫ সালে বেইজিংয়ের ঘোষণায় উল্লেখ করা হয়।

একনজরে দেখে নেওয়া যাক মানির ঠিক আগে কোন নামটি আসে। অন্যতম একজন হলো, সিমোন ডি বোভোয়ার (Simone De Beauvoir)। তার মতে, কেউ নারী হিসেবে জন্মায় না, নারী হয়ে ওঠে। সে তার বই The Second Sex-এ দাবি করে- যৌন পরিচয় হলো আরোপিত, গৃহপালিত, সামগ্রিক সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের ফলাফল। যেখানে আল্লাহ বলছেন, "... পুরুষ নারীর মতো নয়..."।" কিন্তু সিমন বলছে, তারা একই। পরিবেশই তাদের পার্থক্য এবং স্টেরিওটাইপড এবং সেকেলে সেক্সিস্ট ভূমিকা তৈরি করে। তা না হলে নারী একদম পুরুষের মতোই ভূমিকা পালন করতো

উপমহাদেশে ট্রান্সজেন্ডার

লিঙ্গ পরিবর্তন করা এবং বিপরীত লিঙ্গের মতো আচরণ করা এখন কেবল গ্রহণযোগ্যই নয়; বরং আলিঙ্গন ও উদ্যাপন করার মতো কিছু একটা হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই আদর্শের অনুসারীরা তাদের সাথে বিশ্বের অন্য সকল নৃগোষ্ঠী ও সংস্কৃতির উদ্যাপনের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করে। অর্থাৎ, তাদের দাবি হলো, ট্রান্সজেন্ডার নারীকে সত্যিকার নারী হিসেবে না দেখলে সেটা বর্ণবাদ। যদিও-বা তার মধ্যে নারীর কিছুই নেই।

যেটাকে একসময় বলা হতো 'জেন্ডার আইডেন্টিটি ডিসঅর্ডার' সেটাকে এখন বলা হচ্ছে 'জেন্ডার ডিসফোরিয়া' (Gender Dysphoria) এবং 'জেন্ডার ইনকনগ্রুয়েন্স' (Gender Incongruence)। বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা এখন আর একে মানসিক স্বাস্থ্যের সমস্যা হিসেবেও দেখে না। এখন তারা একে বলে, "যৌনস্বাস্থ্যজনিত সমস্যা"। অর্থাৎ

এটাকে একটা মানসিক সমস্যা হিসেবে দেখা হবে না, যেখানে রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে তার সত্যিকার লিঙ্গ মেনে নিতে কাউন্সিলিং করা হয়। এখন সেই ব্যক্তিকে ইচ্ছামতো জেন্ডার গ্রহণ করার স্বাধীনতা দেওয়া হবে। "জেন্ডার অ্যাফার্মেশন" (gender affirmation) স্বাস্থ্যসেবার মাধ্যমে তাকে সে-জেন্ডারের ব্যাপারেই নিশ্চয়তা দিতে হবে। আমরা পাশ্চাত্য ও সেক্যুলার ধারণার একটি উৎপাদন হিসাবে ট্রান্সজেন্ডার জীবনধারার গ্রহণযোগ্যতা বোঝার চেষ্টা করব (শুধুমাত্র একজনের লিঙ্গ সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর চিন্তাভাবনা নয়)। এটি অবশ্যই একটি বৈধ ও যুক্তিসঙ্গত বোঝাপড়া।

আমরা প্রাচীন হিন্দুধর্মে এই জীবনধারার গ্রহণযোগ্যতার কিছু উদাহরণ খুঁজে পাই। হিন্দুধর্ম মনে করে, জেন্ডার ৩টি। তৃতীয় জেন্ডার হলো এমন কেউ, যে পুরুষও না, নারীও না। এ-ধরনের বর্ণনা সবচেয়ে পুরোনো কিছু হিন্দু ধর্মগ্রন্থে আছে। হিজড়া বলতে সেখানে বোঝানো হতো সেসব পুরুষ, যারা নারীর পোশাক পরে এবং নারীর মতো আচরণ করে। তৃতীয় লিঙ্গের ধারণাটিকে এমন একটি ব্যাপার হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যা গর্ভধারণের সময় শুরু হয়। ব্যাপারটা বোঝার জন্য আসুন প্রাচীন হিন্দু বই 'সুশ্রুত সংহিতা' থেকে একটা উদাহরণ দেখে আসি।

"লিঙ্গহীন একটি শিশু... যখন ডিম্বাণু ও শুক্রাণু সমান হয় (তাদের গুণমান ও পরিমাণে)"।

"একজন... (গর্ভবতী মহিলা) যার পাশ উঁচু হয়ে গেছে এবং যার পেটের অগ্রভাগ ফুটে উঠেছে, সে একটি লিঙ্গহীন সন্তানের জন্ম দেবে..."।""

এছাড়াও প্রাচীন হিন্দু মহাকাব্য, রামায়ণ ও মহাভারতের সংস্করণ রয়েছে, যেখানে হিজড়া ও নপুংসকদের উদাহরণ আছে।

অস্পষ্ট লিঙ্গ-পরিচয় হিন্দুধর্মে নতুন নয়। একে সংশোধন করা উচিত বলেও তারা মনে করে না। হিজড়াদের যৌন আচরণের জন্য শাস্তি হতে পারে; কিন্তু তা স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ

নয়। প্রাচীন হিন্দু আইনী পাঠ্য মনুস্মৃতিতে যে-ধরনের শাস্তির কথা বলা হয়েছে তার কিছু উদাহরণ এখানে দেওয়া হলো-

"ধর্মশাস্ত্রে এমন কোনো শ্লোক নেই, যা বিশেষভাবে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের মধ্যে যৌন-আচরণ নিষিদ্ধ করে। দুটি শ্লোক সাধারণ পুরুষদের মধ্যে যৌন মিলনের ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়...। তবে প্রায়শ্চিত্তের কাজটি একটি নিছক আচার স্নান; এবং এটি শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ বা দু'বার জন্ম নেওয়া শ্রেণির জন্য প্রযোজ্য। যে দুইবার জন্মানো পুরুষ কোনো পুরুষের সাথে বা স্ত্রীলোকের সাথে ষাঁড় দ্বারা টানা গাড়িতে, জলে বা দিনের বেলায় সংগমে লিপ্ত হয়, তাকে তার পোশাক পরে স্নান করতে হবে।

"একজন ব্রাহ্মণকে আঘাত করা, মদ, প্রতারণা এবং পুরুষের সহবাসে লিপ্ত হওয়ার মতো অপ্রীতিকর জিনিসগুলোকে জাতপাতের ক্ষতির কারণ বলে ঘোষণা করা হয়েছে"।"

"জাতপাতের এই ক্ষতি স্থায়ী ছিল না। কারণ, এটির প্রায়শ্চিত্ত করা যেতে পারে। তবে সাধারণত আশা করা হয় যে, অবিবাহিত ব্রাহ্মণদের ব্রহ্মচর্য পালন করা উচিত"।৫২

অনেক হিন্দুই এখন ট্রান্সজেন্ডারিজমের বিরোধিতা করছে। তারা একে পশ্চিমাদের আমদানি বলে মনে করছে। কিন্তু অনেকে দাবি করছে, ট্রান্সজেন্ডারিজম না; বরং এর বিরোধিতাই আমদানি হয়েছে পাশ্চাত্য থেকে। ব্রিটিশ উপনিবেশবাদী শাসনামলে সমকামিতাকে অবৈধ করা হয় এবং দণ্ডবিধি সেকশন ৩৭৭-এ একে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এ-আইন করা হয়েছিল লিঙ্গ কেটে হিজড়া দাবি করা মানুষদের জন্য। ব্রিটিশরা বুঝতে পেরেছিল, তারা সমকামী যৌনসম্পর্কে লিপ্ত।

ব্যাখ্যায় তারা বলছে-

"...কর্তৃপক্ষ ১৮৯৭ সালে আইন সংশোধন করে 'নপুংসকদের' একটি বিজ্ঞাপিত গোষ্ঠী হিসাবে স্পষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করে। এখানে নপুংসক হলো সেসব পুরুষ, যারা নিজেরা

স্বীকার করেছে অথবা মেডিকেল পরীক্ষণে পরিষ্কারভাবে দেখা গেছে যে, তারা নপুংসক। এখানে বলা হয়েছে ভারতীয় হিজড়াদের কথা (যারা ছিল মূলত পুরুষ)। দেখা যেত, তাদের মধ্যে অনৈতিক যৌনসম্পর্ক অর্থাৎ সমকামিতা আছে। "

ব্রিটিশরা এ-ধরনের আচরণকে অসহনীয় মনে করতো। তাই ব্রিটেনেও এসব নিষিদ্ধ ছিল। হ্যাঁ, সমকামিতার বিরুদ্ধে আইন উপনিবেশবাদী আমলের। তার মানে এ-আইন ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীদের। কিন্তু, শুধুমাত্র ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের সময় হওয়াই কি একটা আইন ভুল প্রমাণিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট?

এমনকি উপমহাদেশের কিছু এলজিবিটিকিউ অ্যাক্টিভিস্ট স্বীকার করেছেন, ৩৭৭ ঔপনিবেশিক যুগের আইন ছিল কি না-তাতে কিছু যায় আসে না। তাদের মুখেই শোনা যাক।
“আজ মানুষের ব্যক্তিগত বিষয়ে এই হাস্যকর আইনি অনুপ্রবেশের জন্য ব্রিটিশদের দোষারোপ করার কোনো মানে নেই। আমরা বহুদিন ধরেই আমাদের বিষয়ের দেখভাল করার জন্য যথেষ্ট স্বাধীন ছিলাম এবং ব্রিটিশরা অনেক আগেই তাদের আইন-বই থেকে এসব আইন মুছে ফেলেছে।"৬৬

সমকামিতার বিরোধিতা এ-উপমহাদেশে পুরোপুরি বাইরে থেকে এসেছে- এমনও নয়। ইসলামী মুঘল শাসনামলে (১৬ থেকে ১৭ শতক) অনেক হিন্দুও এই প্রথার বিরুদ্ধে ছিল। ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে ভারতে আইনটি বাতিল করে 'ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তি আইন' ২০১৯ সালের আইনে পাশ করা হয়। ভারত পৃথিবীর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ জনসংখ্যার দেশ। সেদেশে এই আইন অনেক বড়ো কিছু। এছাড়াও ২০১৮ সালে পাকিস্তান 'ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তি (অধিকার সুরক্ষা) আইন' পাশ করেছে সেখানকার এমন কমিউনিটির অধিকার রক্ষা করার জন্য। (পরবর্তীতে এ-আইন পরিবর্তন হয়)।

এই আইনগুলোর শিকড় অন্তত এক দশক আগে থেকে ছিল। ২০০৯ সালে পাকিস্তান একটি আইন পাশ করে, যাতে 'তৃতীয় লিঙ্গ' ব্যক্তিদের জাতীয় পরিচয়পত্রে তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবেই উল্লেখ করা সম্ভব হয়। বাংলাদেশ ২০1৪ সালে অনুরূপ একটি আইন পাশ

করেছে, যেখানে সরকারি নথিতে পুরুষ ও নারীর সাথে 'অন্যান্য' লিঙ্গের জন্য একটা স্থান একটি আইনি বিকল্প হিসেবে অনুমতি দিয়েছে। ২০১৮ সালে তাকে বদলে 'অন্যান্য'-এর স্থানে 'হিজড়া' দিয়েছে। ভারতও ২০১৪ সালে সমস্ত আইনি নথিতে 'তৃতীয় লিঙ্গ' পরিচয়ের বিকল্প হিসেবে লেখার পক্ষে রায় দিয়েছে। মজার বিষয় হলো, হিন্দু-সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতে পেনাল কোড-৩৭৭ উল্টে গেলেও বাংলাদেশ ও
পাকিস্তানে তা হয়নি। হিজড়াদের সরকারি স্বীকৃতির অধিকার আছে, কিন্তু সমকামিতা অবৈধ রয়ে গেছে।

বাংলাদেশে ট্রান্সজেন্ডার

১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩, দৈনিক প্রথম আলো-তে প্রকাশিত 'নারী থেকে পুরুষ হয়েছেন তিনি, এখন জটিলতা বাংলাদেশ রেলওয়ের চাকরিতে' শিরোনামের প্রতিবেদনে শারমিন আক্তার ঝিনুক নামে এক নারীর কথা বলা হয়েছে। এই নারী শারীরিকভাবে পুরোপুরি সুস্থ। কিন্তু অন্য 'নারীর প্রতি আকৃষ্ট' হওয়ার কারণে 'নারী থেকে পুরুষে রূপান্তরিত' হয়েছেন তিনি। নতুন নাম নিয়েছেন জিবরান সওদাগর। তার ভাষায়-

জিবরান বলেন, 'আমি ছিলাম নারী। মাসিক হওয়াসহ সবকিছুই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু যত বড় হচ্ছিলাম, বুঝতে পারছিলাম আমি অন্য ছেলে বা পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার চেয়ে নারীর প্রতি বেশি আকৃষ্ট হচ্ছি। স্কুলড্রেসের ওড়না পরতে বা মেয়েদের মতো পোশাক পরতে ভালো লাগত না। একটা সময় একজন মেয়ের সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক হয়। চার বছর সম্পর্ক ছিল। কিন্তু সেই মেয়ে চলে যাওয়ার পর মনে হয়, আমি পুরুষ হলে তো ও

এভাবে চলে যেত না।... গতকাল সোমবার প্রথম আলো কার্যালয়ে এসে জিবরান বলেন, ২০২১ সালে তিনি ভারত থেকে স্তন ও জরায়ু কেটে ফেলা, পুরুষাঙ্গ পুনঃস্থাপনসহ মোট তিনটি বড় অস্ত্রোপচার করেছেন। এতে খরচ হয়েছে প্রায় সাত

লাখ টাকা। চাকরির কাগজপত্র, জাতীয় পরিচয়পত্র, পাসপোর্টসহ বিভিন্ন নথিতে জিবরান এখনো শারমিন আক্তার ঝিনুক নামেই
আছেন।

এ বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, শারমিন আক্তার নামের এ নারী শারীরিকভাবে পুরোপুরি সুস্থ ছিলেন। আরেকজন নারীর প্রতি তার বিকৃত কামনা ছিল। এই কামনাকে সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য তিনি নিজেকে 'পুরুষে রূপান্তরিত' করেছেন। এখন আবদার করছেন আইন ও সমাজ তাকে যেন পুরুষ হিসেবেই মেনে নেয়।
শারীরিকভাবে পুরুষ হয়ে নিজে নারী দাবি করার ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আরেকজনকে বলতে দেখা যাচ্ছে—

'আমি জন্মগতভাবে একজন ছেলে, কিন্তু আমার ফিলটা (অনুভূতি) মেয়েদের মতো। মনটা যেহেতু মেয়ে, শরীরটা মেয়ের মতো পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা সব সময় কাজ করে। আয়নার সামনে দাঁড়ালে তখন তো মনে হয়, এই শরীর তো আমার নয়। সেদিক থেকে অবশ্যই শরীরটা একটা মেয়ের শরীরের আদলে কে না পেতে চাইবে?'।১।

বাংলাদেশে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ নিয়ে কাজ করা অ্যাক্টিভিস্টদের মধ্যে অন্যতম হো চি মিন ইসলাম। সেই করোনার সময় থেকে শুরু করে বেশ কয়েক বছর ধরে তাকে বিশেষভাবে ফোকাস করা হচ্ছে মিডিয়াতে। ২। কিছুদিন আগে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ প্রতিষ্ঠায় আইন তৈরির দাবিও জানিয়ে এসেছেন তিনি। ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ আসলে কী, তা বেশ খোলাখুলি আলোচনা করেছেন এই অ্যাক্টিভিস্ট। তার বক্তব্যগুলো দেখা যাক।

'ট্র্যান্সজেন্ডার ও হিজড়াদের মধ্যে পার্থক্য কী?', শিরোনামে সময় টিভির এক প্রতিবেদনে তিনি বলছেন,

'ট্র্যান্সজেন্ডার মানুষ যারা তারা হচ্ছে তাদের জন্ম হয় ছেলে হিসেবে, বাট সামহাও, তাদের শৈশব বা কৈশোরে যাবার পরে... যেমন আমার জীবনের ২১ বছর পার হবার পর আমি বুঝতে পেরেছি আমি একজন পুরুষ না। আমার নিজেকে বুঝতে, আমার নিজের যৌনতাকে বুঝতে আমার একুশটা বছর পার করতে হয়েছে... গণ

তিন বছর আগের আরেক সাক্ষাৎকারে তাকে বলতে দেখা গিয়েছিল-

'আমার পুরুষাঙ্গ আছে, কিন্তু আমি একজন নারী। আমার বুকে পশম আছে, মুখে দাড়ি ওঠে, কিন্তু আমিও একজন নারী। শুধু যোনি আর স্তন দিয়ে আপনি একজন নারীকে বিচার করতে পারেন না... আমি পুরুষের শরীরে জন্মেও আসলে পুরুষ নই...'
এই ধরনের পুরুষের শরীর নিয়ে জন্মায় যে বাচ্চারা, কিন্তু একটা সময় পর গিয়ে চিন্তা করে যে তার শরীরটা ভুল...বা তার শরীরের সাথে তার মনের, তার সত্তার একটা সংঘাত হয়। গ১।

৭ অক্টোবর ২০২৩-এ প্রথম আলো-তে প্রকাশিত 'অস্ত্রোপচার করে পুরুষ থেকে নারী হয়েছি, গোপন করার কিছু নেই: হো চি মিন ইসলাম' শিরোনামের প্রতিবেদনে দেখা যায়-হো চি মিন ইসলাম বলেন,

'আমার শরীরটা পুরুষের ছিল, কিন্তু ছোটবেলা থেকেই আমি নিজেকে নারী ভাবতাম। অবশেষে অস্ত্রোপচার করে পুরুষ থেকে নারী হয়েছি, গোপন করার কিছু নেই। এখন আমি শারীরিক ও মানসিকভাবে একজন নারী।

অস্ত্রোপচারের আগে আমার শরীরটা ছিল পুরুষের। নিজের আইডেন্টিটি বা পরিচিতির জন্য এবং নিরাপত্তার জন্যও অস্ত্রোপচার করাটা জরুরি ছিল...'।২।

হো চি মিন ইসলামের কথা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের সাথে শারীরিক কোনো সমস্যার সম্পর্ক নেই। তাদের শরীর সুস্থ, তাদের সমস্যা হলো মনে; তাদের অনুভূতিতে। লক্ষ করার মতো আরেকটি বিষয় হলো, হো চি মিন ইসলাম 'লিঙ্গ

পরিবর্তন অপারেশন করেছেন' ২০২৩ সালে। কিন্তু এর কমপক্ষে তিন বছর আগে থেকেই সামাজিক ও আইনিভাবে তাকে এবং তার মতো অন্যদের নারী হিসেবে মেনে নেওয়ার দাবি করে আসছেন তিনি।

অর্থাৎ, তাদের দাবি হলো অস্ত্রোপচার হোক বা না হোক, যখন থেকে কেউ নিজেকে বিপরীত লিঙ্গের বলে দাবি করা শুরু করবে, তখন থেকেই সামাজিক ও আইনিভাবে এ দাবি মেনে নিতে হবে।

বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী সমকামিতা অবৈধ , যা ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ ভারত সরকারের 1860 সালের ধারা 377 থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ।

2014 সালে, *হিজড়ারা* বাংলাদেশের মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক সংহিতিকৃত আনুষ্ঠানিক তৃতীয় লিঙ্গ স্বীকৃতি লাভ করে , ভোটার তালিকায় তৃতীয় লিঙ্গ বিকল্প এবং হিজড়া প্রার্থীরা সরকারি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

বৈষম্যের বিরুদ্ধে কোনো আইনি সুরক্ষা ছাড়াই বাংলাদেশে সমকামিতা ব্যাপকভাবে অস্বীকৃত।সমকামী, সমকামী, উভকামী, ট্রান্সজেন্ডার এবং বিচিত্র পরিচয়কারী ব্যক্তিরা প্রায়শই তাদের লিঙ্গ পরিচয় এবং যৌন অভিমুখতার জন্য হয়রানি, বৈষম্য, অপব্যবহার এবং সহিংসতার অভিযোগ করে । যদিও হিজড়ারা সাধারণত বেশি গৃহীত হয় এবং ঐতিহাসিকভাবে সাংস্কৃতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তারা গুরুতর বৈষম্য এবং বিভিন্ন সামাজিক পরিষেবা যেমন আবাসন এবং স্বাস্থ্যসেবাগুলিতে অসম অ্যাক্সেসের সম্মুখীন হয়।

বাংলাদেশে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের প্রসারে পুরোদমে কাজ করছে মিডিয়া। ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ নিয়ে ইতিবাচকভাবে নানা ধরনের প্রতিবেদন নিয়মিত আসছে নিউজ মিডিয়াতে। গুগল ও ইউটিউবে ট্র্যান্সজেন্ডার লিখে সার্চ দিয়ে যে-কেউ এ কথা যাচাই করে দেখতে পারেন। নিউজ মিডিয়ার পাশাপাশি বিনোদন জগতের মাধ্যমেও ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের পক্ষে প্রচারণা চালানো হচ্ছে। সুন্দরী প্রতিযোগিতাতেও নারী সাজা পুরুষদের স্থান দেওয়া হচ্ছে। বলা বাহুল্য, এগুলোর মূল উদ্দেশ্য হলো সমাজে আলোড়ন তৈরি করা।

সমকামিতা ও ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ আন্দোলনের পেছনে সবচেয়ে বড় দাতাদের তালিকা করলে প্রথম তিনের মধ্যে নির্ঘাত একটি নাম পাবেন, আরকাস ফাউন্ডেশন (Arcus Foundation)। এই ফাউন্ডেশন তৈরি করেছে আমেরিকান বিলিয়নেয়ার জন স্ট্রাইকার। স্ট্রাইকার নিজে একজন সমকামী।

২০০৭ থেকে ২০১০-এর মধ্যে বিভিন্ন সংস্থাকে দেওয়া আরকাস ফাউন্ডেশনের অনুদানের পরিমাণ ৫৮.৪ মিলিয়ন ডলার। পরের ১২ বছরে সংখ্যাটা বেড়েছে আরও বহুগুণ। স্ট্রাইকারের সাথে অনেকদিন ধরে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে আরেক সমকামী ধনকুবের টিম গিল। গিল, স্ট্রাইকার এবং তাদের ক্ষমতাবান বন্ধুরা মিলে এলজিটিবিকিউ ট্যান্সজেন্ডার মতবাদ

এজেন্ডা নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন সংস্থাকে সব মিলিয়ে মোট ১ বিলিয়ন ডলারের বেশি অনুদান দিয়েছে।" এই বিপুল পরিমাণ অনুদানের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে সূক্ষ্ম ও বিস্তৃত এক নেটওয়ার্ক।

আরকাস ফাউন্ডেশনের সাথে জড়িত বা তাদের কাছ থেকে অনুদান পাওয়া সংস্থ্যর মধ্যে প্রথমেই আসবে ইলগা (ILGA)-এর নাম। ১৬০টিরও বেশি দেশ মিলিয়ে মোট ১৭০০টিরও বেশি সংস্থার সাথে কাজ করা এই এনজিও জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের উপদেষ্টার পদমর্যাদা উপভোগ করে।নি

আবার বাংলাদেশে যারা সমকামিতা ও ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের প্রসার কাজ করছে, তাদেরকে নানাভাবে সহায়তা করছে এই আন্তর্জাতিক এনজিও। এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে আছে বাংলাদেশিদেরও আনাগোনা।

অর্থাৎ নানান হাত ঘুরে স্ট্রাইকারদের দেওয়া অনুদানের ডলার আমাদের এ মাটিতেও সমকামিতা, ট্র্যান্সজেন্ডারবাদসহ নানা বিকৃতির প্রচার ও প্রসারে দেদারসে খরচ হচ্ছে।

ট্রান্সজেন্ডারবাদ নিয়ে কাজ করা দেশীয় এনজিওগুলোর সাইটে আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়দের সাথে সম্পর্কের কথা খোলাখুলি বলা আছে, যে কেউ যাচাই করে নিতে পারেন।

ট্র্যান্সজেন্ডার অ্যাক্টিভিস্টরা পৌঁছে গেছে প্রধানমন্ত্রীর অফিসেও। ১০ আগস্ট, ২০২৩- এ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে-

'প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ট্র্যান্সজেন্ডার হো চি মিনের সাক্ষাৎ

ট্র্যান্সজেন্ডার মানুষদের জন্য আজকের দিনটি মাইলফলক বলে মন্তব্য করেছেন ট্র্যান্সজেন্ডার হো চি মিন ইসলাম। বৃহস্পতিবার (১০ আগস্ট) গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর হো চি মিন ইসলাম এক ফেসবুক স্ট্যাটাসের মাধ্যমে এ কথা বলেন।

খুব শীঘ্রই ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ সংসদেও পৌঁছে যাবে, আর তারপর রাষ্ট্রযন্ত্রের সুবাদে ঢুকে

পড়বে ঘরে ঘরে, এমন আশঙ্কা এখন আর অমূলক মনে হওয়ার কথা না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

হিজড়া আর ট্রান্সজেন্ডার এক?

আমাদের সমাজে হিজড়া বা তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের ধারণা আছে। ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের কথা শুনলে অধিকাংশ মানুষ মনে করেন-এটা হয়তো হিজড়াদের অধিকার নিয়ে কোনো আন্দোলন। মূলত এ দুটো জিনিস একেবারেই আলাদা। আসুন, পুরো ব্যাপারটা ভেঙে ভেঙে দেখা যাক, ঠিক কোন কোন জায়গাতে ভুলগুলো হচ্ছে।

মানুষ হয় পুরুষ অথবা নারী। যাদের দেহ শুক্রাণু উৎপাদনের জন্য তৈরি, তারা পুরুষ; যাদের দেহ ডিম্বাণু উৎপাদনের জন্য তৈরি, তারা নারী। এটি শুধু বাহ্যিক 'যন্ত্রপাতি'-এর বিষয় নয়, এটি পুরো প্রজননব্যবস্থার বিষয়। (১১

মানবজাতির মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক কিছু মানুষ আছেন, যাদের প্রজননব্যবস্থা এবং যৌন বিকাশের ত্রুটি থাকে। বাহ্যিকভাবে তাদের দেহে জন্মগতভাবে নারী ও পুরুষ উভয়ের বৈশিষ্ট্যের মিশ্রণ দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে। এ ধরনের মানুষকে বোঝাতে যে শব্দটি ব্যবহৃত হয়, তা হলো ইন্টারসেক্স (Intersex) বা আন্তঃলিঙ্গ। বাংলাদেশে সাধারণ মানুষ হিজড়া বলতে মূলত ইন্টারসেক্স বা আন্তঃলিঙ্গ মানুষদের বুঝিয়ে থাকে। সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ী জনসংখ্যার মাত্র ০.০১৮% মানুষ ইন্টারসেক্স বা হিজড়া হন। ৯৯.৯৮২% মানুষ স্বাভাবিক শরীর নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেন।।২।

যে বিষয়টি আমাদের বোঝা দরকার, তা হলো-ইন্টারসেক্স বা আন্তঃলিঙ্গ মানুষরা তৃতীয় কোনো লিঙ্গ নয় বা দুটোর মাঝামাঝি কিছুও নয়, তারাও নারী অথবা পুরুষ; তবে

ডা. খন্দকার মেহেদী আকরাম এর মতে, হিজড়া আর ট্রান্সজেন্ডার কোনোভাবেই এক নয়। এই দুই শ্রেণির মধ্যে রয়েছে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। মেডিকেলের পরিভাষায় হিজড়াদের লিঙ্গকে বলে ইন্টারসেক্স। এই লিঙ্গের মানুষেরা হারমাফ্রোডাইট নামেও পরিচিত। এদের শরীরে গঠনগতভাবে পুরুষ এবং মহিলা জননাঙ্গ এবং হরমোনের মিশেল থাকে, তাই এককভাবে তাদের পুরুষ বা মহিলা লিঙ্গে বিভক্ত করা যায় না।

অন্যদিকে, ট্রান্সজেন্ডাররা হলো সিসজেন্ডারের বিপরীত। "সিসজেন্ডার" টার্মটা ব্যবহার করা হয় তখন যখন একজন পুরুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ করে পরবর্তিতে নিজেকে পুরুষ হিসেবে ভাবে বা পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। একই টার্মটি সিসজেন্ডার নারীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ট্রান্সজেন্ডারদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা সম্পূর্ণই উল্টো। একজন মানুষ যখন পুরুষ জননাঙ্গ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে পরবর্তিতে নিজেকে নারী হিসেবে পরিচয় দিতে এবং ভাবতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে তখন তাদের আমরা ট্রান্সজেন্ডার নারী বলি। একইভাবে একজন নারী জননাঙ্গ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে পরবর্তিতে নিজেকে পুরুষ হিসেবে দাবি করলে তাকে ট্রান্সজেন্ডার পুরুষ বলা হয়।

মানুষের সেক্স ক্রোমোজোম 46 XX ও XY ছাড়াও জেনেটিক্যাল এরোর এর কারনে 45 XO, 47XXX, 47XXY সৃষ্টি হতে পারে।

যা পরবর্তীতে ঐ সকল জিনধারী ব্যাক্তিবর্গের লিঙ্গ নির্ধারণে ত্রুটির সৃষ্টি করে এবং সেক্সুয়াল বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে মানসিক ও শারীরিকভাবে সন্দেহের কারণ হতে পারে।

চিকিৎসার মাধ্যমে কি ধরনের রুপান্তর হয়!?কিছু উদাহরণ

ট্রান্সজেন্ডার নারী কিংবা পুরুষ হওয়ার জন্য কিছু সার্জারী এবং হরমোনাল ট্রিটমেন্টের প্রয়োজন হয়।

ট্রান্সজেন্ডার হওয়ার দুধরনের পদ্ধতি রয়েছে

১। MtF - Male to Female

২। FtM Female to Male

MtF এবং FtM উভয়ের ক্ষেত্রে চিকিৎসা পদ্ধতি শুরু হয় Hormone Replacement Therapy দিয়ে। সেক্ষেত্রে শরীর সাড়া দিলে MtF দের ক্ষেত্রে Estrogen এবং FtM দের ক্ষেত্রে Androgen হরমোন দেয়া হয়।

যার প্রভাবে পুরুষের শরীরে মেয়েলী এবং নারীদের শরীরে পুরুষালি বৈশিষ্ট্য সমূহ প্রকট এবং দৃশ্যমান হতে থাকবে।

এক্ষেত্রে MtF এর মেয়েলী ভাব সম্পূর্নরুপে প্রকাশিত হওয়ার জন্য Facial Faminition Surgery (FFS) এবং Voice Faminization Surgery (VFS) করা যেতে পারে।

এরপর শুরু হয় প্রধান অস্ত্রপাচারসমূহ। তবে এগুলো কয়েকটি ধাপে করানো হয়। যেমনঃ

MtF এর ক্ষেত্রে:

Breast Augmentation (স্তন বৃদ্ধি)

Orchidectomy (শুক্রাশয় অপসারণ)

Penectomy (পুং লিঙ্গচ্ছেদ)

Vaginoplasty (যৌনী তৈরি করা)

FtM এর ক্ষেত্রে:

Mastectomy (স্তন অপসারণ)

Oophorectomy & Vaginectomy (জরায়ু ও ডিম্বাশয় বাদ দেয়া)

Metoidioplasty (ক্লিটোরিস থেকে লেবিয়া মাইনরা থেকে বাদ দিয়ে পুংলিঙ্গের স্থান নির্ধারন করা)

Phalloplasty (পুংলিঙ্গ গঠন)

এছাড়াও পরবর্তীতে আরো সৌন্দর্য ও স্বাভাবিক হওয়ার জন্য Voice musculation, Glansplasty, Scrotoplasty, Urethroplasty, Male Chest reconstruction ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের সার্জারি করানো হয়।

বর্তমানে ট্রান্সজেন্ডার ছাড়াও আরো কিছু সর্মাথক শব্দসূচক ব্যক্তি/ সংগঠন তাদের নামের অ্যাক্রোনিম হিসেবে LGBTQ(Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer/Questioning individualকমিউনিটির সৃষ্টি করেছে। যা সারাবিশ্বে তাদের অস্তিত্ব এবং অধিকার নিয়ে কাজ করে থাকে।

পৃথিবীর জনসংখ্যার ০.৬-৩% জনসংখ্যা ট্রান্সজেন্ডার

হিসেবে ধরা হয় যেখানে তাদের বেশিরভাগই অবস্থান করছেন জার্মানী এবং সুইডেনে। অন্যদিকে, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর জনশুমারি বলছে, দেশে হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডার জনগোষ্ঠীর মোট সংখ্যা ১২ হাজার ৬২৯।

২০২১ সালের বিশ্বের প্রায় ২৭ টি দেশের পরিসংখ্যান অনুযায়ী শীর্ষ ১০ দেশের ট্রান্সজেন্ডার এর হার হচ্ছে,,,

Germany-3%

Sweden-3%

India-2%

Hungary-2%

Argentina -2%

Brazil-2%

Russia-2%

Canada-2%

Australia-2%

Canada-2%

Australia-2%

England (United Kingdom)-2%

আমেরিকা এবং কানাডায় মেডিকেল শিক্ষার্থীদের পরিচালিত একটি পরিসংখ্যানে উঠে এসেছে, প্রায় ১৫২ টি প্রতিষ্ঠানের ১৫.৮% শিক্ষার্থী নিজেদেরকে যৌন ও লিঙ্গ সংখ্যালঘু হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

আমাদের এশিয়াটিক ও মধ্যপ্রাচ্য দেশগুলোতে সমাজ ও ধর্মে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদকে নিষিদ্ধ ও অসামাজিক কার্যকলাপ হিসেবে ধরা হয়। এ সংক্রান্তে বিশ্বের প্রায় ৭০টি দেশ ট্রান্সজেন্ডার এবং তাদের প্রতীককে অবৈধ ঘোষণা করেছে এবং ১২ টি দেশে এর বিরুদ্ধে শাস্তির বিধান রয়েছে যার সবোর্চ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত করা হয়েছে।

তবে, পাশ্চাত্য দেশসমূহে এটাকে স্বাভাবিক এবং গনতান্ত্রিক অধিকার হিসেবে ধরা হয় এবং কিছু দেশে তাদের অধিকার রক্ষায় সরকারিভাবে নিয়ম নীতি রয়েছে।

বায়োলজিক্যালি ট্রান্সজেন্ডার হওয়ার প্রকৃতিক কোন উপায় নেই তবে নিজস্ব ধারনা, ইচ্ছা, প্রতিবন্ধকতা কিংবা বৈশিষ্ট্য অনুসারে অস্ত্রোপাচার কিংবা শারীরিক পরিবর্তনের ট্রান্সজেন্ডার হওয়া সম্ভব।

এছাড়াও US Fenway Health এর তথ্যমতে, মানসিক, পারিবারিক এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি এক্ষেত্রে বেশি প্রভাবিত করে। সেগুলো হলোঃ

পারিবারিক চাপ (৩৫.৫%)

সম্প্রদায় বা সামাজিক কলঙ্কের চাপ (৩২.৫%)

চাকরি খোঁজার সমস্যা (২৬.৮%)

তাদের লিঙ্গ পরিচয় বা নিজস্ব ইচ্ছা (১০.৩%)

স্বাথ্যকর্মীদের ভুল বুঝানো (৫.৬%)

ধর্মীয় নেতাদের চাপ (৫.৩%)

তাদের লিঙ্গ পরিচয় সম্পর্কে সন্দেহ (২.৪%)

তৃতীয় অধ্যায়

আইনী সমস্যা:

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ স্বাভাবিকীকরণের কিছু আইনি ও সামাজিক সমস্যা সহজেই চোখে পড়ে। নিজেকে পুরুষ দাবি করা নারী উত্তরাধিকার ভাগ পাবে কীভাবে? অ্যাক্টিভিস্টদের দাবি হলো, যে নিজেকে পুরুষ দাবি করবে, তাকে বাবার সম্পত্তি থেকে পুরুষের সমান ভাগই দিতে হবে। খসড়া আইনেও এমনটাই থাকার কথা। এমনটাই হয়েছে পশ্চিমা দেশগুলোতে। এ ধরণের ফলাফল সমাজে কেমন বিশৃঙ্খলা তৈরি করবে?

নিজেকে নারী দাবি করা পুরুষ কি নারীদের বাথরুম, নারীদের কমনরুম ব্যবহার করবে? আপনি কি চাইবেন আপনার বোন, স্ত্রী বা সন্তান কোন ট্র্যান্সনারীর সাথে একই বাথরুম ব্যবহার করুক? কী হবে কোনো পুরুষ যখন শাড়ি বা সালোয়ার-কামিজ পরে মেয়েদের সালাতের জায়গায় এসে উপস্থিত হবে? নিজেকে পুরুষ দাবি করা নারী কি সালাত আদায় করবে পুরুষদের সাথে একই কাতারে?

ধানমন্ডি বয়েজে ক্লাস নাইনের শারীরিকভাবে সুস্থ কোনো ছাত্র যদি হঠাৎ নিজেকে মেয়ে দাবি করা শুরু করে এবং রাষ্ট্র যদি তাকে ভিকারুননিসা স্কুলে ভর্তি হওয়ার সুযোগ করে দেয়,তাহলে সেটা কি মেনে নেওয়া উচিত হবে? কিশোরদের ছোট্ট বালিকা আর কিশোরীদের বাথরুমে কিংবা কমনরুমে ঢুকতে দেওয়ার ফলাফল কি খুব একটা ভালো হবে?

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদকে বৈধতা দেওয়ার অর্থ সামাজিকভাবে যে জায়গাগুলো নারীদের জন্য নির্ধারিত, সেখানে পুরুষের অনুপ্রবেশের পথ করে দেওয়া। একটু চিন্তা করলে এ সমস্যাগুলো যে-কেউ ধরতে পারবেন। কিন্তু এর চেয়েও বড় সমস্যা আছে।

সমকামিতা স্বাভাবিককরন

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের অবধারিত ফলাফল হলো, সমকামিতার স্বাভাবিকীকরণ এবং বৈধতা দেওয়া। মনে করুন, জামাল নামের এক পুরুষ নিজেকে নারী বলে দাবি করা শুরু করল। আইন তাকে নারী বলে মেনে নিল। এখন বিয়ে কিংবা যৌনচাহিদা মেটাতে গিয়ে সে কী করবে?

সে যদি কোনো পুরুষকে বেছে নেয়, তাহলে সেটা হবে সমলিঙ্গের সাথে যৌনতা। কারণ, জামাল যদিও নিজেকে নারী দাবি করছে, কিন্তু আসলে সে একজন পুরুষ। সে যাকে বেছে নিয়েছে, সেও পুরুষ। কাজেই এটা সমলিঙ্গের মধ্যে যৌনতা। যদিও 'দূর থেকে' তাদের স্বামী-স্ত্রী বা প্রেমিক-প্রেমিকা মনে হয়।

অন্যদিকে জামাল যদি কোনো নারীকে বেছে নেয়, তাহলে কার্যত সেটা সমলিঙ্গের মধ্যে যৌনতা হবে না। কিন্তু আপাতভাবে সমাজের চোখে-যারা বিস্তারিত জানবে না, তাদের কাছে-একে মনে হবে সমকামিতা। কারণ, জামাল নিজেকে নারী হিসেবে উপস্থাপন করে একজন নারীর সাথে যৌন সম্পর্ক করছে।

অর্থাৎ যা-ই বেছে নেওয়া হোক না কেন, দিন শেষে সমকামিতার স্বাভাবিকীকরণ ঘটবে।

অসুস্থতা / বিকৃতির স্বাভাবিকরণ

এক সময় পুরো বিশ্বজুড়ে বিবাহকে পুরুষ ও নারীর মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সামাজিক বন্ধন হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হতো। কিন্তু বর্তমানে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এর অর্থ পরিবর্তন করে ফেলা হয়েছে। দাঁড় করানো হয়েছে ভিন্ন একটি অর্থ। পলিঅ্যামরি (Polyamory) থেকে সমকামিতা-নৈতিক ও আইনগতভাবে সমাজে কী কী গ্রহণযোগ্য, তা আমাদের চোখের সামনে পরিবর্তিত হচ্ছে। যদিও কিছু ক্ষেত্রে বিবাহের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের ফলে বহুবিবাহের কিছু সুবিধা অনেক মানুষের সামনে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। তবে বিবাহের সংজ্ঞা এত ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়েছে যে, এটি অর্থহীন হয়ে পড়েছে।

এই আর্টিকেলে আলোচিত পলিঅ্যামরাস সম্পর্কের এই বর্ণনাটি বিবেচনা করুন-

"অ্যান্ডি আইজেনসন (Andy Izenson)", রু খান, ক্যাল টি এবং আইডা ম্যান্ডুলে (Aida Manduley) এমন একটি কল্পরাজ্য তৈরি করার পরিকল্পনা করেছিল যেখানে কুইয়ার, ট্রান্স ও পলিঅ্যামবাস লোকেরা নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে পারবে। বছরের পর বছর ধরে তারা সেই কল্পরাজ্যের গল্প একে অপরকে শুনিয়েছে। শেষমেশ, ২০১৭'র শেষে যখন অ্যান্ডি ও রু'র ভাড়া বাসার মেয়াদ শেষ হয়, তখন এসে উপস্থিত হয় সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। নিউ হ্যাম্পশায়ারে বসবাসরত ক্যাল সেখানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল। বোস্টনের সাইকোথেরাপিস্ট আইডাও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেখানে স্থানান্তরিত হওয়ার পরিকল্পনা করে। তারা হাডসনের আলস্টার পার্কে চৌদ্দ একরের একটি বাড়ি খুঁজে পায়। তারা তাদের বাড়িকে উল্লেখ করতো Rêve বা স্বপ্ন বলে।

অন্যদের মতো অ্যান্ডির সর্বনামও 'তারা' (They/Them) এবং নিজেদেরকে 'লিঙ্গ দ্বিধাবিভক্ত' বলে বর্ণনা করে। ত্রিশের কোটায় থাকা একেকজন আইনজীবী তারা। কথা বলে চটপটে লম্বা লম্বা বাক্যে। তাদের চোখ প্রশস্ত আবেগপূর্ণ ছিল। তাদের সর্বনামের প্রতি গুরুত্ব কম। 'আপনি যদি আমার সম্পর্কে একটি বাক্য বলেন, আপনি যা-খুশি সর্বনাম ব্যবহার করতে পারেন,' তারা বলে। 'এগুলো সবই মানুষের অভিজ্ঞতাকে শব্দে

অনুবাদ করতে ভাষার অসম্পূর্ণ শক্তির বহিঃপ্রকাশ। আমরা সবাই জেন্ডারকুইয়ার। 'পলিঅ্যামরাস' যেমন আমার যৌনচর্চার একটি মোটামুটি কাছাকাছি বর্ণনা, তেমনি 'ট্রান্স-ম্যাস্কুলিন' আমার জেন্ডারের একটি যথেষ্ট কাছাকাছি বর্ণনা।'

রু বলল, 'আমি 'সমিতি' (Caucus) শব্দটি পছন্দ করি। আমরা পলিঅ্যামরিস্টদের সঙ্গে সমিতি করি। তুমি ট্রান্স-ম্যাসকুলিন লোকদের সঙ্গে সমিতি করো, আমি ট্রান্স-ফেমিনিন লোকদের সঙ্গে সমিতি করি। আমি এর থেকে স্বাধীন, কিন্তু আমি তোমার পাশে আছি।'

চারজন সঙ্গীর মধ্যে বিভিন্ন রোমান্টিক বিন্যাস রয়েছে। তবে অ্যান্ডির বাকি তিনজনের সাথেই রোমান্টিক সম্পর্কে রয়েছে। তাছাড়া তাদের সকলেরই 'ধূমকেতু' আছে। ধূমকেতু হলো তাদের দলের বাইরের প্রেমিক-প্রেমিকা,যারা হঠাৎ আসে এবং চলে যায়। 'যত বেশি লোক হবে, এই কাঠামোটা তত স্থিতিশীল থাকবে,' অ্যান্ডি বলেছিল"।

উল্লিখিত বিবরণটি পড়ার পরেও আপনি যদি এর ভিত্তিতে 'বিবাহ' শব্দটিকে সংজ্ঞায়িত করতে পারেন, তবে আপনাকে একটা পুরস্কার দেওয়া উচিত। আর যদি এটা পড়ে এর ভিত্তিতে 'পুরুষ' ও 'নারী' শব্দগুলোকে সংজ্ঞায়িত করতে পারেন, তবে দ্বিতীয় আরেকটি পুরস্কার প্রাপ্য আপনার।

ব্যাপারটা হাস্যকর। যেই লোকগুলো দাবি করছে, আমরা যেন এই আজগুবি বিষয়গুলো বুঝি এবং এগুলো ব্যবহার করি, ওই একই লোকেরা বলছে-সবকিছুই 'ফ্লুইড' এবং মোটাদাগে অনির্ণেয়। তাহলে আপনি যে পলিঅ্যামরিস্টদের সাথে সমিতি করেন, এটা বলার উদ্দেশ্যটা কী?

আমাদের পরিচিত এবং আল্লাহ-নির্ধারিত সমাজব্যবস্থা ভেঙে পড়ার পাশাপাশি এর আরেকটি বিপদজনক দিক হলো, একে অপরের সাথে যোগাযোগ করতে সৃষ্ট জটিলতা। অথচ ভাষার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো, স্পষ্ট ভাব প্রকাশের মাধ্যমে যোগাযোগ করা।

মানুষের বায়োলোজির বিরুদ্ধে এই যুদ্ধের যত স্বাভাবিকীকরণ হবে, এই বিকৃত চর্চার প্রতি আপাত-দুর্বল মানুষেরা তত বেশি আকৃষ্ট হবে। শত হোক, আমরা সবাই-ই তো মানুষ।

এমন কোনো ব্যক্তির মাথায় কী চিন্তাভাবনা ঘুরপাক খেতে পারে, তা অনুমান করা যায়? "আমার হেলথ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি স্ত্রী হরমোন থেরাপি অফার করে; আমার সবসময়ই মনে হয়েছে আমি পুরুষ হবার মতো যথেষ্ট কঠোর নই, নারীদের মতো কোমল"।

বিবাহের ক্ষেত্রেও বিষয়টা একই, "আমি আমার স্ত্রীকে ভালোবাসি, ঠিক আছে। কিন্তু আরেক নারীকেও আমার ভালো লাগে। হতে পারে আমার স্ত্রীও তাকে পছন্দ করে। সে আমাদের বিবাহের 'ধূমকেতু' হতে পারে। হয়তো কিছুদিনের জন্য আমরা পলিঅ্যামরাস সম্পর্কে জড়াতে পারি। বাচ্চাদের নিয়ে একদিন এ-বিষয়ে আলোচনায় বসা যায়। নিজেকে ভালোবাসার এমন তীব্র আকর্ষণ থেকে বিমুখ করব কেন? বরং এতে আমি সুখী হব"।

এ-ধরনের কামনার পিছনে ছোটাকে যদি সমাজে গ্রহণযোগ্য হিসেবে দেখা হয়, তবে ওই সমাজের সদস্যরা সহজেই এ-ধরনের জীবনযাপনের প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং চর্চা করবে।

সব ধরনের সোশ্যাল মিডিয়া ও অন্যান্য মিডিয়ায় এ-ধরনের যৌনবিকৃতি প্রদর্শন করা হচ্ছে; এ-ধরনের আচরণকে স্বাভাবিক ও গ্রহণযোগ্য হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। তাছাড়া রাজনৈতিক নেতারাও বুঝতে শুরু করেছে- ক্ষমতায় টিকে থাকতে হলে "জন্মদানকারী অভিভাবক" (birthing parent) ও "মানব দুগ্ধ"-এর মতো শব্দ ব্যবহার করতে হবে; ১০০ বলতে হবে "ভালোবাসা তো ভালোবাসাই, তা আপনি যে-লিঙ্গেরই হোন না কেন"। তারা ও সিআইএ-র লোকেরা ভালো করেই জানে, এ-ধরনের আলোচনা জনগণকে বিভ্রান্ত করার মোক্ষম হাতিয়ার এবং তারা নিজেদের প্রোপাগাণ্ডা ছড়াতে স্বেচ্ছায় এই হাতিয়ার ব্যবহার করে।

যারা বলেছিল কারও শোবার ঘরে কী ঘটে তাতে নাক গলানো কারও উচিত না, তারা যে নিজেদের বোকা বানাচ্ছিল-তা এখন স্পষ্ট। জনগণ ওইসব বিষয় সম্পর্কিত আইনকে বৈধতা দেওয়ার জন্য ভোট দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, বরং এখন আলোচনা অন্ধকার সুরঙ্গের আরও গভীরে পৌঁছে গেছে। যেমন ধরুন, সমকামিতা এতটাই স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে যে, সাংস্কৃতিক যুদ্ধ এখন প্যানসেক্সুয়ালিটির মতো জটিল ও সূক্ষ্ম বিষয়ে ফোকাস করছে। বাস্তবে LGBTQ এবং 'প্লেটনিক১০০,

প্যানসেক্সুয়াল, নন-হেটেরোনর্মেটিভ'' যুগলরা অর্থনৈতিক লাভ ও সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা উভয়ই চায়।

এ-ধরনের সম্পর্ক কি অসংখ্য নিউক্লিয়ার ফ্যামিলির জায়গা নিয়ে নেবে? অনেকে বিষয়টিকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছে, কিন্তু Institute for Family Studies-এর এই গবেষণাটির দিকে খেয়াল করলে দেখা যায়-

"আত্মকেন্দ্রিকতা, ব্যক্তিগত পূর্ণতা, সহিষ্ণুতার মতো লিবারেল নীতিনৈতিকতা ও মূল্যবোধ বৃহত্তর সামাজিক বলয়ে উপকারী হলেও এগুলো প্রায়শই সুস্থিত, বিবাহিত পরিবারে টানাপোড়েন সৃষ্টি করে। তাছাড়া গবেষণায় উঠে এসেছে,ষাটের দশক থেকে এ-ধরনের ব্যক্তিকেন্দ্রিক মূল্যবোধ প্রসারের সাথে অধিক সহবাস (cohabitation), স্বল্প বিবাহ, অধিক বিবাহবিচ্ছেদ ও অত্যধিক পারিবারিক অস্থিতিশীলতার দৃঢ় যোগসূত্র রয়েছে"।

তারা ব্যক্তিকেন্দ্রিকতাকে একটি সমস্যা হিসেবে উপস্থাপন করছে। বিষয়টি বেশ গুরুত্ববহ। কারণ, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা মানুষের নিজের কামনা-বাসনাকে বৃহত্তর স্বার্থের ঊর্ধ্বে স্থান দেয়। সাংস্কৃতিক যুদ্ধগুলো সেই ব্যক্তিগত কামনা- বাসনাকে জোর করে আমাদের সকলের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে। "আমার পলিঅ্যামরাস, জেন্ডার নন-কনফার্মিং সম্পর্কগুলোকে গ্রহণ করে নাও, যাতে আমিও তোমাদের মতো বাচ্চা পালন করতে পারি। আমি নিজেকে যা হিসেবে পরিচয় দেবো আমি সেটাই-আমি একজন পুরুষ;

যদিও আমার যোনি আছে। আমাকে নারী/পুরুষের বাথরুম ব্যবহার করতে দাও, নারীদের খেলায় অংশগ্রহণ করতে দাও। আমি একজন জন্মদানকারী অভিভাবক এবং আমি আমার বাচ্চাকে মানবদুগ্ধ পান করাচ্ছি, মাতৃদুগ্ধ না।

সহজাত প্রকৃতি ও শিশুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

হঠাৎ করে কেন আমরা বিকৃত যৌনাচারের বন্যায় ভেসে যাচ্ছি? কেনইবা সমগ্র বিশ্বে রীতিমতো জোর করে ট্রান্সজেন্ডারিজম চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে? কারা এই কাজে সমর্থন দিচ্ছে এবং কেন? কেন মানুষের ফিতরাতের বিরুদ্ধে এমন যুদ্ধ ঘোষণা করা হলো?

ফিতরাতের বিরুদ্ধে এ-যুদ্ধের মূল কারণকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

১. এই যুদ্ধের সমর্থকদের অর্থনৈতিক লাভ;

২. মানুষকে দাসে পরিণত করা এবং তাদের প্রতিরোধস্পৃহা ভেঙে ফেলা; এবং

৩. মানবসভ্যতার উত্তরসূরিদের নিয়ন্ত্রণ করা।

ফিতরাতের শত্রু এবং যৌন-উন্মাদনার সমর্থকদের আরেকটি নতুন, বৃহৎ ব্যাবসা দাঁড় করালো-ট্রান্সজেন্ডারিজম বা রূপান্তরকামিতা।

কীভাবে জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো কোনো ব্যক্তির লিঙ্গ পরিবর্তনের অধিকারের ওপর ফোকাস করছে। এটা আগে নিষিদ্ধ ছিল। এরপর ১৮ বছরের ঊর্ধ্বে ব্যক্তিদের জন্য বৈধ করা হয় অভিভাবকের অনুমতি ছাড়াই। এরপর ১২ বছর বা

তদূর্ধ্বদের জন্য, এরপর ৪ বছর বা তদূর্ধ্বদের জন্য বৈধ করা হয়। যেমনটা স্কটল্যান্ডে হয়েছে। এক্ষেত্রেও অভিভাবকের অনুমতি দরকার নেই।

ছোটো ছোটো বাচ্চা ছেলে-মেয়েদের লিঙ্গ পরিবর্তন করতে উৎসাহিত করার এ-বিষয়টি সম্পর্কে কখনো ভেবে দেখেছেন?

রবার্ট হোগল্যান্ড নামক এক কানাডিয়ান ব্যক্তির মেয়ে স্কুলে এক সমকামিতা বিষয়ক মুভি দেখে এবং তার বাবাকে বলে, সে ছেলে হতে চায়। ওই ব্যক্তি ক্ষুব্ধ হয়ে স্কুলে যায় এর বিরোধিতা করতে। কিন্তু, স্কুল কর্তৃপক্ষ তাকে জানায়-তার মেয়ে স্বাধীন, আইন তার পক্ষে। কানাডার আদালত ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে রায় দেয় এবং সে অশ্রুসিক্ত চোখে দেখতে থাকে তার মেয়ে-স্কুল যার বিচারবুদ্ধি বিকৃত করেছে-পুরুষের হরমোন নিচ্ছে এবং অস্ত্রোপচার করে আজীবনের জন্য নিজের শরীর বিকৃত করছে। মেয়েটি চেয়েছিল, তার বাবা যেন তাকে একটা ছেলেদের নাম দেয়। কিন্তু লোকটি তা করতে অস্বীকৃতি জানালে তাকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

কানাডাসহ অন্যান্য দেশে কোনো শিশুকে তার লিঙ্গ পরিবর্তন না করার উপদেশ দেওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ; যার সাজা ৫ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড। কারা বাচ্চাদেরকে নিজের শরীর বিকৃত করতে এবং আজীবন ঔষধের ওপর নির্ভরশীল হতে প্ররোচিত করছে? এটা খুবই লাভজনক এক ব্যাবসা এবং এতে বিনিয়োগকারীর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। মিডিয়া ও বিকৃত পাঠ্যক্রম দ্বারা প্ররোচিত হচ্ছে তারা। তারা রেকর্ড পরিমাণ সময়ে তাদের লভ্যাংশ পাঁচগুণ করবে বলে আশাবাদী-৩১৬ মিলিয়ন থেকে ১.৫ বিলিয়ন ডলার। তারা আশাবাদী যে- "তৃতীয় বিশ্বের" সরকারগুলো এ-আইন প্রণয়ন করবে। যাতে করে এই ব্যাবসা সেখানে বিস্তৃতি লাভ করে।

এই যৌন-উন্মাদনা প্রসারের মাধ্যমে একদল বিলিয়নিয়ারের কোম্পানিগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে লাভবান হচ্ছে। তারা সমকামিতা ও ট্রান্সজেন্ডারিজম সমর্থন করে। আপনি

দেখবেন, তাদের কেউ কেউ "মানবাধিকার" সংস্থা প্রতিষ্ঠা করছে। যেগুলোয় প্রাথমিকভাবে গে ও ট্রান্সজেন্ডার অধিকার সংরক্ষণের স্লোগান দেওয়া হয়। তারা শিক্ষাক্রম, মিডিয়া ও আইন পরিবর্তন করতে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে। কিন্তু তার চেয়েও বেশি আয় করে মানুষকে যৌনতার দাস ও কামাসক্ত যন্ত্রে পরিণত করার মাধ্যমে।

দ্যা ফেডেরালিস্টের একটি আর্টিকেলে ফিতরাতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাকারী বিলিয়নিয়ার লবির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছয়টি উপাদান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, বিলিয়নিয়ার জন স্ট্রাইকারের কথাই ধরুন। সে অনেকগুলো কোম্পানির মালিক। তন্মধ্যে 'স্ট্রাইকার মেডিকেল কর্পোরেশন' অন্যতম। যা সার্জিক্যাল সরঞ্জাম তৈরি করে। ট্রান্সজেন্ডার সার্জারি নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব। স্ট্রাইকার মানবাধিকার সংস্থা আরকাস (Arcus) ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করে। এই ফাউন্ডেশনের অনুদান হিসেবে স্ট্রাইকার কত টাকা দিয়েছে? ১৯৯৭ নাগাদ ৫০০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি এবং কেবল গত পাঁচ বছরে ৩৪০ মিলিয়ন।

আরকাস কোন ধরনের অধিকার সমর্থন করছে? পতিতাবৃত্তির জন্য বিক্রি হওয়া নারীদের অধিকার? নাকি আফ্রিকা থেকে ফ্রান্স ও পশ্চিমের লুট করা সম্পদ তাদের ফিরে পাবার অধিকার? নাকি নিপীড়িত মুসলিমদের অধিকার? নাকি লাখ লাখ মানুষের নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসেবা-লাভের অধিকার? এগুলোর একটিও না। আরকাস তহবিল "সমকামী ও ট্রান্সজেন্ডার অধিকার" অর্থাৎ, ফিতরাতের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে সমর্থন করে। স্ট্রাইকার ছিল ওবামার সমর্থক। ওবামা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর স্ট্রাইকার ও তার সহচরদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছিল সমকামিতা ও ট্রান্সজেন্ডারিজমের সমর্থনে আইন পাশ করানোর মাধ্যমে।

স্ট্রাইকারের আরকাস ফাউন্ডেশন প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছে যে, তারা মুসলিম বিশ্বকে টার্গেট করেছে। আরকাসের ওয়েবসাইটে গিয়ে "Global Religions" খুঁজে দেখুন। এ-বিষয়ে আলাদা আলোচনা করা দরকার। ফাউন্ডেশনটির দাবি-তারা জাতিসংঘ ও আইনপ্রণেতাদের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বে "ধর্মীয়" এলজিবিটি-পন্থিদের সমর্থন করে। আর যারা ধর্মের "অপব্যবহার" করে এলজিবিটি সদস্যদের মানবাধিকার অস্বীকার করে, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে।

আরকাসের স্ট্র্যাটেজিক ফান্ডিং এরিয়া কোনগুলো? অর্থাৎ, এই সংস্থার ব্যয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাত কী কী?

প্রথমত, টার্গেটেড কমিউনিটিতে এলজিবিটি কণ্ঠের সমর্থন; বিশেষ করে মুসলিমবিশ্বে। তাই আপনি যখন ফিলিস্তিনে এলজিবিটি কমিউনিটির সমর্থনে মিছিল হতে দেখবেন, বুঝবেন যে, এর পেছনে মানবিক কোনো কারণ নেই। বরং আছে সমর্থক সংস্থাগুলোর বৃহৎ বাজেট। আর যখন অ্যাক্টিভিস্ট ও আইনপ্রণেতাদের গে ও ট্রান্সজেন্ডারদের অধিকার দাবি করতে দেখবেন, কিন্তু বিশ্বে ঘটা অন্যায়-অত্যাচার সম্পর্কে চুপ, বুঝবেন যে-এটা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ নয়; বরং আরকাসের মতো অন্যান্য সংস্থার ব্যাবসা বিস্তারের প্রয়াস।

আরকাসের ব্যয়ের দ্বিতীয় খাত হলো-এলজিবিটি সদস্যদের অধিকার খর্ব করতে ধর্মের "অপব্যবহারের" বিরুদ্ধে লড়াই করা। এখানে 'লড়াই' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে; যেহেতু সকল দিক থেকেই এটি একটি ফান্ডেড ওয়ার এবং আমেরিকাসহ আন্তর্জাতিকভাবে এলজিবিটি বিরোধীদের জন্য একটি 'চ্যালেঞ্জ'। তারা এমন এক বৈশ্বিক বাজার চায়, যেখানে কোনো বর্ডার বা ধর্মের বাধা থাকবে না। তাদের বিরুদ্ধে যে-ই দাঁড়াবে, তার সাথেই লড়াই করতে এবং তাকে ক্রিমিনালাইজ করতে চায় তারা।

ফিতরাতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সমর্থনকারী লবির আরেক সদস্য হলো-বিলিয়নিয়ার পেনি প্রিট্যকার। সেও ছিল ওবামার নির্বাচনি প্রচারণার গুরুত্বপূর্ণ সমর্থক। নির্বাচনে বিজয়ের পর ওবামা আইনে বেশ বড়ো বড়ো পরিবর্তন আনে এবং সমকামিতা ও ট্রান্সজেন্ডারিজমের প্রসারে সরকারি তহবিল থেকে বরাদ্দ দেয়।

যৌন-উন্মাদনা বিস্তারের মাধ্যমে লাভবান হওয়ার ছয়টি উপায় নিয়ে আমরা আলচনা করেছি। সপ্তম ক্ষেত্র হিসেবে চলুন ট্রান্সজেন্ডারিজম নিয়ে-বিশেষ করে ট্রান্সজেন্ডারিজমের সমর্থনে যেসব ঔষধ ও হরমোন ব্যবহার করা হয়, তা নিয়ে আলোচনা করা যাক।

২০২১ সালে এই ব্যাবসার বাৎসরিক আয় ছিল প্রায় ১৪ বিলিয়ন ডলার। তারা ২০২৮ সাল নাগাদ এই সংখ্যা ২১ বিলিয়ন করতে চায়।

পুরুষরা নেয় নারীদের হরমোন আর নারীরা পুরুষের। এছাড়াও আছে পিউবার্টি ব্লকার। এগুলো নেয়ার জন্য বাচ্চাদের উৎসাহিত করা হয়। বলা হয় তুমি, ছেলে হও বা মেয়ে, যদি লিঙ্গ পরিবর্তন করতে চাও, তবে এই ওষুধ তোমার বয়ঃসন্ধিকালীন লক্ষণগুলো দমন করে রাখবে। এতে করে তুমি যে-লিঙ্গের হতে চাও, সার্জারি করে তাতে পরিবর্তন করা সহজ হবে। আর যদি ইতোমধ্যেই সার্জারি করে ফেলো, তবুও পিউবার্টি ব্লকার নাও। ফলে তোমার বয়ঃসন্ধিকালে নিসৃত প্রাকৃতিক হরমোন তোমার পরিবর্তিত লিঙ্গের সাথে সমস্যা করবে না।

এই ওষুধ তারা এমন ছেলেকে দেয়, যে বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছতে চায় না; যেহেতু সে তার ছেলে পরিচয়কে ঘৃণা করে এবং এমন মেয়েকে দেয়, যে তার মেয়ে পরিচয়কে ঘৃণা করে। অবশ্য এসব ছেলে-মেয়েদের এমন অবস্থা তারাই করেছে।

Mayo-এর মতো "স্বনামধন্য" সায়েন্টিফিক সাইটগুলো এহেন জঘন্য কাজ সমর্থন করে এবং একে "পিউবার্টি ডিসফোরিয়া", অর্থাৎ, বয়ঃসন্ধিকালীন দুঃশ্চিন্তা ও বিষন্নতার চিকিৎসা হিসেবে অভিহিত করে। ক্লিনিকগুলোয় এ-ধরনের ওষুধের চাহিদা অধিক হারে বাড়ছে। এতে করে লাভবান হচ্ছে ফার্মাসিউটিক্যাল্স কোম্পানিগুলোও। আর এগুলো সবই বৈধ, যতক্ষণ "বিভ্রান্তিকর প্রোপাগাণ্ডা" এড়িয়ে চলা হবে।

লৈঙ্গিক রূপান্তরে ব্যবহৃত হরমোন এবং পিউবার্টি ব্লকার উৎপাদনকারী একটি ফার্মাসিউটিক্যাল্স কোম্পানি হলো 'AbbVie'। সেই সাথে এই কোম্পানি সমকামিতা ও ট্রান্সজেন্ডারিজম কালচারও প্রচার করে। তারা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার খরচ করে এই কালচারের পক্ষে লবিং করতে। টেক্সাসের একজন খ্যাতিমান আইনজীবী AbbVie-এর মতো ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা করে। তার দাবি- এই কোম্পানিগুলো কিশোর- কিশোরীদের কাছে পিউবার্টি ব্লকার বিক্রি করার জন্য বিভ্রান্তিকর মার্কেটিং করে থাকে।

এক অস্বস্তিকর ভবিষ্যতের অপেক্ষায়...

বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাকের মানবসম্পদ বিভাগের অধীনে পে-রোল অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন জারা রহমান। আপাদমস্তক পুরুষ জারা রহমান নিজেকে দাবি করছেন নারী বলে। নারীদের মতোই তিনি অধিকার চান, নারীদের পোশাক পরতে চান, নারীদের সাথেই থাকতে চান। ছোটোবেলা থেকে তার বিভিন্ন বাধার করুণ গল্প লিখেছে প্রথম আলো। অনেক জায়গায় মেয়েদের সাথে থাকতে চাওয়ার পরে সাধারণ কমনসেন্সের জায়গা থেকে তাকে থাকতে দেয়নি কেউ। এমন অনেক দাবি করার পরে মিরপুরের নওয়াব ফয়জুন্নেছা কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলে জায়গা পেয়েছে।

ট্রান্সজেন্ডার এজেন্ডা সম্পর্কে না জানলে প্রথম শোনায় আপনার সেই ছেলেটার প্রতি মনে সহানুভূতি আসতে পারে। কষ্টও লাগতে পারে। কিন্তু এ-দাবি বাস্তবায়নে আছে ভয়াবহ অন্ধকারাচ্ছন্ন গল্প। যে-গল্প প্রতিদিন লেখা হচ্ছে পশ্চিমে। যে-গল্পে প্রতিনিয়ত পিষ্ট হয় সাধারণ নারী ও বালিকারা। সে- গল্প আপনাকে জানতে দিতে চায় না প্রথম আলোরা...

অ্যাডাম গ্রাহাম স্কটল্যান্ডের একজন ধর্ষক। দুইজন নারীকে ধর্ষণের অভিযোগে তার বিচার শুরু হয়। মজার ব্যাপার হলো, বিচার চলাকালীন হঠাৎই নিজেকে নারী দাবি করতে শুরু করে এই ধর্ষক। নাম বদলে চুল বড়ো করে হয়ে যায় আইলা ব্রাইসন। যথারীতি ধর্ষণের দায়ে তাকে সাজা প্রদান করা হয়-৮ বছরের কারাদণ্ড। দু-দু'টো নারীকে ধর্ষণের অভিযোগে কারাদণ্ড পাওয়া গ্রাহাম নিজেকে নারী দাবি করার কারণে তাকে নারীদের কারাগারেই প্রেরণ করে আদালত। পরবর্তীতে বাকি নারীদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে তাকে পুরুষদের কারাগারে প্রেরণ করা হয়।

যাক! নারীরা যৌন নির্যাতন থেকে এবারের মতো বেঁচে গেল। তাই না?

না।

স্টিফেন টেরেন্স উডের কুখ্যাতি রয়েছে বিকৃত যৌনাচারের কারণে। প্রথম সে জেলে যায় দুজন ৯ ও ১২ বছরের ছেলেকে যৌন হয়রানির অপরাধে। ১৮ মাস জেল খেটে বের হয়ে সে ভদকা খাইয়ে ধর্ষণ করে তার বন্ধুর গর্ভবতী স্ত্রীকে। সে-সময় তার বিচার না হলেও পরবর্তীতে হত্যাচেষ্টার কারণে জেলে যায় সে। শুধুমাত্র নিজেকে মেয়ে দাবি করার কারণে যৌন নিপীড়নের ইতিহাস থাকা সত্ত্বেও তাকে নারীদের জেলে প্রেরণ করে আদালত। সেই জেলে সে তিন মাসে চারজন নারীকে যৌন নিপীড়ন করে। জেলে আসার আগেও সে ধর্ষণ করেছিল দুইজন নারীকে।

এ-ধরনের ঘটনা শুধু যে অপরাধী কয়েদিদের সাথে ঘটছে, এমনটাই নয়। ঘটছে সাধারণ নারীদের সাথেও।

৫২ বছর বয়সি ড্যারেন ম্যারিগার একজন রেজিস্টার্ড সেক্স অফেন্ডার। জঘন্য ধরনের যৌন নির্যাতনে অভিযুক্ত হয়েছিল সে। পরবর্তীতে নিজেকে নারী বলে দাবি করার কারণে নারীদের বাথরুমে তাকে যাওয়ার অধিকার দেয় উই স্পা। অন্যান্য নারী ও বালিকাদের সামনে নিজের জামা কাপড় খুলে উলঙ্গ হয়ে ওয়াশরুমের কাজকর্ম করছিল সেক্স অফেন্ডার ড্যারেন। তাতে প্রচন্ড অফেন্ডেড হয়ে সেখানে প্রতিবাদ করেন নারীরা। যৌন নির্যাতনের জন্য রেজিস্ট্রি থাকা পুরুষ লোককে কেন নারীদের টয়লেটে ঢুকতে দেওয়া হবে-তা নিয়ে তারা ৫টি মামলা করেন।

বাদ যাচ্ছে না ছোটো বালিকারাও।

আমেরিকার লউডন কাউন্টিতে ছাত্র-ছাত্রীদের বাবা-মাকে জানানো বাদেই স্কুলের কর্তৃপক্ষ নিয়ম করে-যে-কোনো ছেলে নিজেকে মেয়ে দাবি করলে মেয়েদের টয়লেটে মেয়েদের সাথে যেতে পারবে। তার কিছুদিনের মধ্যেই নিজেকে মেয়ে দাবি করা একজন ছেলে মেয়েদেরকে যৌন হয়রানি করছে বলে অভিযোগ দায়ের করে ভিক্টিম দুই ছাত্রী। যখন এক যৌন নিপীড়নের শিকার ছাত্রীর বাবা স্কুলের বোর্ড মিটিংয়ে বিষয়টি তুলে প্রতিবাদ করতে যান, তখন তাকে ঘৃণা প্রচারের অভিযোগে গ্রেফতার করে ভার্জিনিয়ার পুলিশ। মেয়ের সম্মানের জন্য রুখে দাঁড়ানোও সেখানে পাপ।

ট্রান্সজেন্ডারদের অধিকারের পক্ষে আইন পাশ হলে আপনাকে আইনগতভাবে কোনো ছেলের মৌখিক দাবির উপরে মেনে নিতে হবে-সে একজন মেয়ে। আপনার মেয়েদের ওয়াশরুমে তাকে যাওয়ার অধিকার দিতে হবে। সেটার প্রতিবাদ তো করতে পারবেনই না, এমনকি আপনার মেয়ে যৌন নির্যাতিত হলেও কিছু বলতে পারবেন না। কোনো একদিন শুনবেন, আপনার বোন হোস্টেলে একই রুমে এক ছেলের সাথে থাকছে। যেই ছেলে আপনার বোনের সব প্রাইভেসি তো ভঙ্গ করছেই, হয়তো সুযোগ পেয়ে একদিন করে বসছে শ্লীলতাহানিও। আপনি জানবেনও না; কারণ, সেই ছেলেকে আইন করে মেয়ে বানানো হয়েছে।

এক অস্বস্তিকর ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য।

কথা বলুন। কথা বলতে বলুন। প্রতিবাদ করুন। রুখে দিন এ-মতবাদের প্রচারকদেরকে। বয়কট করুন সব জায়গা থেকে তাদের। নিজের মা-বোন- কন্যার চরিত্র ও সতীত্ব রক্ষা করতে, নিজের ঈমান বাঁচাতে, এ ভূ-খণ্ডের মুসলমানদেরকে রক্ষা করতে কথা বলতেই হবে।

এলজিবিটি এমন কিছু বিষয়ের সমন্বয়, যেগুলোকে পৃথিবীর প্রায় সব সংস্কৃতি ও সভ্যতা ঘৃণা করেছে। খুব ব্যতিক্রম ছাড়া সমকামিতা, ক্রস ড্রেসিং, অঙ্গ কেটে ফেলার মতো বিষয়ের বৈধতা ইতিহাসে কখনোই দেওয়া হয়নি। পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে নিকৃষ্টতম সভ্যতা, সব সভ্যতার খারাপগুলো নিয়ে গঠিত এই পশ্চিমা সভ্যতা এগুলো কেবল চর্চা ও বৈধতাই দিচ্ছে না,জোর করে চাপিয়ে দিতে চাইছে উম্মাতে মুহাম্মাদীর উপরেও। যখন পারছে না তখন স্যাংশন দিচ্ছে, চাপ দিচ্ছে, আদায় করে নিচ্ছে 'অধিকার'।

শকুনদের দৃষ্টি পড়েছে মুসলিমবঙ্গেও। ইলগা, সায়ানের মতো পশ্চিমা এনজিও; বন্ধু, ইনক্লুসিভ বাংলাদেশের মতো পশ্চিমাদের দেশীয় এজেন্টদের মাধ্যমে মিডিয়াকে ব্যবহার করে এদেশেও নিকৃষ্ট কিটদের 'অধিকার'-এর জন্য কাজ করে যাচ্ছে তারা। পশ্চিমের মতো আইন হতে যাচ্ছে এদেশেও। ধ্বংস হতে যাচ্ছে আমাদের পরিবার। নষ্ট হতে যাচ্ছে আমাদের আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ। বিকৃত যৌনাচারের প্রসার হতে যাচ্ছে দেশজুড়ে। আকাশে তুলে উল্টে আছড়ে ফেলে দেওয়া যে-আযাব, তৈরি হতে যাচ্ছে তার ক্ষেত্র!

এবং তা হতে যাচ্ছে খুব শীঘ্রই...

২০২৪ সালের ডিসেম্বরে পাশ হতে যাচ্ছে 'ট্রান্সজেন্ডার সুরক্ষা আইন'। এর মাধ্যমে একদল মানুষ পেতে যাচ্ছে বিকৃত যৌনাচারের অধিকার। স্কুলে ছোটো বাচ্চাদের শেখানো হবে-কেন এগুলো খুব স্বাভাবিক। সে ঘৃণা করলে হবে বদ্ধ মস্তিষ্কের। ঘর থেকে বের হওয়াই দায় হয়ে যাবে মেয়েদের। পাবলিক ট্রান্সপোর্টে মেয়েদের জন্য বরাদ্দ জায়গা থেকে নিয়ে ফিমেইল ওয়াশরুম- সবখানেই থাকবে ছেলের আনাগোনা।

নিজেকে ভিন্ন লিঙ্গের পরিচয় দিয়ে বিয়ে করবে সমকামী প্রেমিকরা, হয়ে যাবে আমার-আপনার প্রতিবেশী।

নতুন বছরে অনেকে অনেক ধরনের শপথ নেয়। নতুন বছরের আগমন মুসলিম হিসেবে আমাদের কাছে খুব খুশির কোনো বিষয় নয়। এর সাথে পবিত্রতার কোনো সম্পর্ক নেই। তাই আপনাদেরকে নতুন বছরকে সামনে রেখে কোনো শপথ নিতে বলব না। কিন্তু এই বছরটা এক ইন্টেন্স সাংস্কৃতিক যুদ্ধের সময় হতে যাচ্ছে। এ-যুদ্ধ পশ্চিমা সমকামী সংস্কৃতির সাথে ইসলামী সংস্কৃতির। এ-যুদ্ধ কুফরের সাথে ঈমানের। এ-যুদ্ধ হিউম্যানিজমের সাথে তাওহিদের। এ লড়াই আমাদের ঈমানের, অস্তিত্বের।

এই যুদ্ধে মুখ ঘুরিয়ে চলে যাবেন না। পিছিয়ে থাকবেন না। স্থবির হয়ে বসে থাকবেন না। চুপ করে থাকবেন না। করা সম্ভব এমন কোনো কাজ থেকে বিরত থাকবেন না। আপনাদের একজন ভাই হিসেবে, উম্মাতে মুহাম্মাদীর নগণ্য সদস্য হিসেবে, আল্লাহর তুচ্ছ দাস হিসেবে আপনাদের কাছে আমি শুধু এটাই বলতে চাই-প্লিজ! হাল ছেড়ে দেবেন না।

ওদের মিডিয়া, অর্থনীতি, হেজেমনি-সবই থাকতে পারে। কিন্তু, আমাদের আল্লাহ আছেন। কয়েকশ' পৃথিবীর কয়েক লক্ষ আর্মি মিলেও যার শক্তির এক ফোঁটার ধারেকাছে পৌঁছাতে পারবে না-তিনিই আল্লাহ। পরাজয় এ-জাতির ইতিহাসে নেই। আমাদেরকে শুধু প্রমাণ করতে হবে-আমরা আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার যোগ্য। জীবন-সম্পদ বিক্রি করে দিতে হবে আল্লাহর পথে। লেগে থাকতে হবে দাঁতে দাঁত চেপে। দৌড়ে, হেঁটে, হামাগুড়ি দিয়ে হলেও এগিয়ে যেতে হবে। কেবল তখনই আসবে আল্লাহর সাহায্য।

"নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা ততক্ষণ পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন (করার চেষ্টা) করে" ।[সুরা র'দ:১১]

চতুর্থ অধ্যায়

~ইসলামে লিংগ ধারণা

ইসলাম আমাদের শেখায়, এ মহাবিশ্বে যা কিছু আছে, যা কিছু দৃশ্যমান এবং যা কিছু অদৃশ্য, সবকিছুর মালিক হলেন আল্লাহ। তিনি মালিকুল মুলক। আসমান ও জমিনসমূহের একচ্ছত্র অধিপতি। বনি আদম বা মানুষ মহান আল্লাহর দাস এবং পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি।

আল্লাহ মানুষকে অসংখ্য নিয়ামত দিয়েছেন। আমাদের শরীর, সুস্থতা, আয়ু, জীবন- সবকিছুই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামত। তিনিই জন্ম, মৃত্যু ও রিজিকের মালিক। কিন্তু এই শরীরের ওপর আমাদের মালিকানা সার্বভৌম না। চাইলেই আমি এই শরীরকে ইচ্ছেমতো বদলাতে পারি না। ইচ্ছেমতো যেকোনো কিছু খেতে পারি না। চাইলেই যেকোনোভাবে, যে-কারও সাথে, যেকোনো সময় ভাগাভাগি করতে পারি না শরীরের উষ্ণতা। মহান আল্লাহর বেঁধে দেওয়া হালাল ও হারামের সীমানা মানুষকে মেনে চলতে হয়। মানুষ দুনিয়াতে অবাধ্য হলে আখিরাতে তার জন্য থাকবে শাস্তি।

আমাদের জান, মাল, সময়, সম্পদ, শরীর-সব ক্ষেত্রে সব অধিকারের উৎস হলেন মহান আল্লাহ। মানুষ নিজে তার অধিকার আবিষ্কার করে না। রাষ্ট্র বা অন্য কোনো পার্থিব শক্তি অধিকার তৈরি করে না। জাতিসংঘের কোনো দলিল, কোনো সংবিধান

কিংবা সামসময়িক মানুষের ধ্যানধারণা থেকে অধিকার আসে না। সৃষ্টির অধিকার আসে সৃষ্টির মালিকের কাছ থেকে। মানুষ সার্বভৌম না। মানুষ কিংবা অন্য কোনো সৃষ্টি নিজের নিয়ম বানাতে পারে না। আল্লাহ যা বৈধ করেছেন, তার বাইরে আর কোনো কিছু করার অনুমোদন মানুষের নেই। আল্লাহ যা অবৈধ করেছেন, তার অনুমোদন দেওয়ার অধিকারও মানুষের নেই।

মুসলিম হিসেবে আমাদের মাপকাঠি হলো ইসলাম। পবিত্র কুরআনের আরেকটি নাম হলো আল-ফুরকান, যার অর্থ হলো সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নির্ধারণকারী। আমরা জানি, সত্য-মিথ্যা, ভালোমন্দ, হারাম-হালাল নির্ধারিত হয় আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল-এর মাধ্যমে।

আল্লাহ ও তাঁর রাসুল কোনো নির্দেশ দিলে কোনো মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী উক্ত নির্দেশের ভিন্নতা করার কোনো অধিকার রাখে না। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে অমান্য করে, সে স্পষ্টতই সত্য পথ হতে দূরে সরে পড়ল।১

আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হলো মহান আল্লাহর ইবাদাত করা এবং তাঁর নির্ধারিত মাপকাঠি অনুযায়ী আমাদের জীবন পরিচালনা করা। আসুন দেখা যাক, এ ব্যাপারে ইসলাম আমাদের কী সমাধান দেয়।

ইসলাম আমাদের স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়, আল্লাহ মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন হয় পুরুষ অথবা নারী হিসেবে। এর বাইরে তৃতীয় লিঙ্গ, ট্র্যান্সজেন্ডার বা অন্য যা কিছু আছে, সেগুলো মানুষের তৈরি করা শ্রেণিবিভাগ।

'আর তিনিই যুগল সৃষ্টি করেন পুরুষ ও নারী। ২।

'আর শপথ তাঁর, যিনি সৃষ্টি করেছেন পুরুষ ও নারী। ভা

'বস্তুত পুত্র কন্যার মতো নয়। (৪)

'আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনাবলি রয়েছে সে কওমের জন্য, যারা চিন্তা করে।।

হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একই ব্যক্তি হতে, আর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং তাদের থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী।

ব্যক্তির কী 'মনে হয়' সেটা নয়, বরং ইসলাম দৈহিক বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে মানবজাতিকে নারী ও পুরুষ হিসেবে নির্ধারণ করেছে। মহান আল্লাহ দেহ আর আত্মপরিচয়ের মধ্যে পার্থক্য করেননি। শরিয়াতে জন্মগত লিঙ্গ আর মনস্তাত্ত্বিক লিঙ্গবোধ বলে আলাদা কিছু নেই। আল্লাহ যাকে পুরুষের দেহ দিয়েছেন, সে পুরুষ; যাকে তিনি

[১] সুরা আহযাব, আয়াত: ৩৬

[২] সুরা নাজম, আয়াত: ৪৫

[৩] সুরা লাইল, আয়াত: ৩

[৪] সুরা আলে ইমরান, আয়াত: ৩৬

[৫] সুরা রুম, আয়াত: ২১

[৬] সুরা নিসা, আয়াত: ১

নারীদেহ দিয়েছেন, সে নারী এবং মহান আল্লাহ ভুল করেন না। যদি কারও মনে হয় সে ভুল দেহে আটকা পড়েছে, তাহলে সমস্যা তার মনে। চিকিৎসার মাধ্যমে মনের রোগের সমাধান করতে হবে। শরীরকে বদলানো যাবে না।

তৃতীয় লিঙ্গ বলে কিছু নেই

ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে তৃতীয় লিঙ্গ বলে কিছু নেই। যদি কোনো মানুষের দেহে নারী ও পুরুষ উভয়ের বৈশিষ্ট্য থাকে, অর্থাৎ কেউ যদি আধুনিক চিকিৎসার পরিভাষায় আন্তঃলিঙ্গ বা Intersex হয়, সেক্ষেত্রেও তাকে হয় নারী বা পুরুষ গণ্য করা হবে; তৃতীয় কিছু না।

যাদের শারীরিক ত্রুটি আছে, তাদের শরীরেও পুরুষ বা নারী কোনো একটি দিকের প্রাধান্য থাকে, এবং সেটি অনুযায়ী তাদের বিচার করা হয়। রাসুলুল্লাহ দৈহিক বৈশিষ্ট্য পুরুষের কাছাকাছি-এমন 'হিজড়াদের' পুরুষ এবং দৈহিক বৈশিষ্ট্য নারীদের কাছাকাছি-এমন 'হিজড়াদের' নারী হিসেবে বিবেচনা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

কিন্তু এমন ব্যক্তি নারী নাকি পুরুষ, তা বোঝা যাবে কীভাবে? এ নিয়ে ইসলামি ইতিহাসের আলিমগণ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে-

কারও মধ্যে যদি নারী ও পুরুষ উভয়ের যৌনাঙ্গ থাকে (অত্যন্ত দুর্লভ) সেক্ষেত্রে কোন দিক দিয়ে সে প্রস্রাব করছে, তার ওপর ভিত্তি করে তাকে নারী অথবা পুরুষ হিসেবে গণ্য করা হবে। উদাহরণস্বরূপ এ ধরনের কোনো ব্যক্তির প্রস্রাব যদি পুরুষাঙ্গ দিয়ে নির্গত হয়, তাহলে সে পুরুষ। তখন সে সমাজ ও আইনের চোখে পুরুষ হিসেবেই গণ্য হবে, এবং সে স্বাভাবিকভাবে পুরুষের মতোই জীবনযাপন করবে।

এভাবে বোঝা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে বয়ঃসন্ধির সাথে জড়িত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের দিকে তাকানো হবে। যদি একেবারে কোনোভাবেই বোঝা না যায়, তাহলে সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিশেষ বিধান প্রযোজ্য হবে। উল্লেখ্য, বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে একজন মানুষের শরীরের প্রজননব্যবস্থা কী শুক্রাণু উৎপাদনের জন্য তৈরি নাকি ডিম্বাণু উৎপাদনের জন্য তৈরি, তা খুব সহজে জানা সম্ভব। কাজেই ইসলামের অবস্থান অনুযায়ী আমল করার ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো জটিলতা নেই।

কোনো ব্যক্তির প্রজননব্যবস্থা পুরুষের, অর্থাৎ তার দেহ শুক্রাণু উৎপাদনের জন্য তৈরি, কিন্তু যৌন বিকাশের ত্রুটির কারণে বাহ্যিকভাবে তার মধ্যে বিপরীত লিঙ্গের কিছু বৈশিষ্ট্য (যেমন স্তনের মতো অঙ্গ) আছে-এমন ক্ষেত্রে সেই ত্রুটি দূর করার জন্য শর্তসাপেক্ষে অস্ত্রোপচারের বৈধতা আধুনিক আলিমগণ দিয়েছেন। একই কথা নারীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যেমন: অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, অনেক কন্যাশিশুর জন্মের সময় যোনিপথ বন্ধ থাকে, যা অপারেশনের মাধ্যমে ঠিক করা সম্ভব, এ ধরনের চিকিৎসা গ্রহণকে ইসলাম নিষিদ্ধ বলে না।

উল্লেখ্য, এ ধরনের অস্ত্রোপচার সীমিত পরিসরে জায়েজ এবং এর উদ্দেশ্য হলো, একজন মানুষের শরীরকে তার দেহের প্রজননন ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা। বিকলাঙ্গতা দূর করা। ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের লিঙ্গ পরিবর্তন সার্জারি সম্পূর্ণ আলাদা

জিনিস। শারীরিকভাবে সুস্থ মানুষের 'লিঙ্গ পরিবর্তন' জাতীয় কোনো অস্ত্রোপচার ইসলামি শরিয়াতে বৈধ নয়।

[১] সুনানে বাইহাকি কুবরা, হাদিস: ১২৯৪/৪২

তৃতীয় লিংগ বনাম ট্রান্সজেন্ডার

যদি কোনো সমাজে এমন কোনো অনাচার প্রবেশ করাতে হয়, যা সেখানকার মানুষ কোনোভাবেই সহ্য করবে না, লিবারেল গ্রুপগুলো তখন সেখানে কিছু ধোঁয়াশা তৈরি করে। নিদারুণ অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তিতে আচ্ছন্ন পথ বেছে নেয়। এভাবে ধীরে ধীরে সমাজকে আরও অধঃপতিত করে এবং চালিত করে আল্লাহ থেকে আরও দূরে যাওয়ার পথে।

এক্ষেত্রে তারা হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডাবের মধ্যকার ভিন্নতা নিয়ে মানুষের মধ্যে যে-অজ্ঞতা আছে, তা কাজে লাগিয়েছে। অস্পষ্ট যৌন বৈশিষ্ট্যযুক্ত ব্যক্তিদের বর্ণনা করার জন্য উর্দুতে বেশ কয়েকটি শব্দ ব্যবহার করা হয়; খুনসা, মুখান্নাস, খোজা সিরা। শেষোক্তটি (খোজা সিরা) মুঘল যুগে নপুংসক করে দেওয়া পুরুষদের বুঝাতে ব্যবহৃত হতো। এরা গার্ডের দায়িত্ব পালন করতো। আজকের পাকিস্তানে এটি হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হয়। তারা ভিক্ষুক ও পতিতা মাফিয়ার একটি অংশ। এই গ্রুপটিই মূলত দেশে ট্রান্সজেন্ডার ও হিজড়াদের মৌলিক অংশ। আধুনিক যে-শহরগুলোতে অশ্লীলতার প্রসার বেশি (যেমন ইসলামাবাদ, লাহোর, করাচি) সেসব জায়গায় তাদেরকে বেশি দেখা যায়।

লক্ষ্য করুন, এখানে হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডারকে একই গ্রুপের অংশ হিসেবে বলা হচ্ছে। এটাই ছিল মূলত সমস্যার গোঁড়া।

ইন্টারসেক্স মানুষ তারাই, যারা অস্পষ্ট যৌনাঙ্গ ও যৌন-বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তা সত্ত্বেও তাদেরকে কোনো একটা লিঙ্গের অংশ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। নানা

বিষয় বিচার করে তাদের লিঙ্গ অনেক আগেই নির্ধারণ করে ফেলা হয়। ট্রান্সজেন্ডার হলো-যে অন্য লিঙ্গের অনুকরণ করে। হতে পারে মানসিক রোগ বা টাকার জন্য (ভিক্ষা ও পতিতা মাফিয়ার মাধ্যমে)। এই শেষোক্ত গোষ্ঠীটি দুর্ভাগ্যবশত পাকিস্তানে বেশ ব্যাপক। সমস্যা হলো, সাধারণ মানুষ ট্রান্সজেন্ডার ও হিজড়া-এ-দুই গ্রুপের মধ্যে পার্থক্য সেভাবে বোঝে না।

মূল বিলের ধারা ২ (n)-এ একজন 'ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তি'কে এইভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে:

"ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তি" হলো, যে-

(i) হিজড়া (খুনসা); যার মধ্যে নারী ও পুরুষের যৌনাঙ্গের বৈশিষ্ট্য আছে বা জন্মগত অস্পষ্টতা আছে, অথবা

(ii) নপুংসক; যাকে জন্মের সময় পুরুষ-লিঙ্গ নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে কিন্তু যৌনাঙ্গ ছেদন বা কাস্ট্রেশনের (খোজাকরণ) মধ্য দিয়ে যায়; বা (iii) একজন ট্রান্সজেন্ডার পুরুষ, ট্রান্সজেন্ডার মহিলা, খোজা সিরা, বা যে- কোনো ব্যক্তি, যার জেন্ডার-পরিচয় এবং/অথবা জেন্ডার-অভিব্যক্তি জন্মের সময় যে-লিঙ্গ নির্ধারণ করে দেওয়া হয়, তার সামাজিক নিয়ম ও সংস্কৃতির প্রত্যাশা থেকে ভিন্ন হয়।"

দেখতেই পাচ্ছেন, এই লিবারেল শক্তিগুলো হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডারদেরকে একই ছাতার নিচে স্থাপন করে বিভ্রান্তি তৈরি করছে। আল্লাহ যাদেরকে নির্দিষ্টভাবে সৃষ্টি করেছেন তাদের প্রতি মানুষের যে-সহানুভূতি, তা ব্যবহার করে তারা এমন কিছু নষ্ট মানুষের প্রতি সহানুভূতি সৃষ্টি করতে চায়, যারা ভিন্ন লিঙ্গের অনুকরণ করে। এভাবে কী অর্জন হবে?

আইনের ধারা ৩-এ বলা হয়েছে:

১. একজন ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির এই আইনের বিধান অনুসারে তার স্ব- অনুভূত লিঙ্গ-পরিচয় অনুসারে স্বীকৃত হওয়ার অধিকার থাকবে।

২. উপ-ধারা (১)-এর অধীনে ট্রান্সজেন্ডার হিসাবে স্বীকৃত একজন ব্যক্তির নিজের NADRA-সহ সমস্ত সরকারি দপ্তরের সাথে স্ব-অনুভূত লিঙ্গ- পরিচয় অনুসারে নিবন্ধিত হওয়ার অধিকার থাকবে।

এভাবেই নারী-পুরুষ ভিন্ন লিঙ্গের বলে স্বীকৃতি পেয়ে যেতে পারে!

NADRA (ন্যাশনাল ডাটাবেস এবং রেজিস্ট্রেশন অথরিটি) হলো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি শাখা, যা জনগণের CNIC (কম্পিউটারাইজড জাতীয় পরিচয়পত্র) তৈরি ও সরবরাহের কাজ করে। আইডি কার্ড ছাড়াও এটি ব্যক্তির ড্রাইভিং লাইসেন্স, এমনকি পাসপোর্টও পরিবর্তন করে। এর অর্থ হলো, 'যদি একজন পুরুষ সিদ্ধান্ত নেয় যে, সে তার লিঙ্গ পরিবর্তন করে মহিলা হতে চায়, তাহলে তাকে আইনত একজন মহিলা হিসাবে বিবেচনা করতে হবে; এবং এর কারণে, সে এখন আইনত একজন পুরুষকে বিয়ে করতে পারে। এতে সে সমকামী বলে বিবেচিত হবে না।' এভাবে একটা মুসলিম দেশে সমকামিতা বৈধতা পেয়ে যাচ্ছে।

পাকিস্তানের আইনে সমকামিতা নিষিদ্ধ। PPC (পাকিস্তান পেনাল কোড)- এর ৩৭৭ ধারা বলছে-

যে-ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোনো পুরুষ, নারী বা পশুর সঙ্গে প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে শারীরিক মিলন করে, সে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে, অথবা যে-কোনো বর্ণনার কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে; যা দুই বছরের কম বা দশ বছরের বেশি হবে না. এবং জরিমানাও দিতে হবে।

উপরন্তু, পাকিস্তান সংবিধানের ২৭৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, 'ইসলামের আদেশ হিসাবে উল্লেখ করা পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত ইসলামের আদেশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সমস্ত বিদ্যমান আইন আনা হবে এবং এ-ধরনের আদেশের পরিপন্থি কোনো আইন

প্রণয়ন করা হবে না।' ব্যাপারটা খুবই অবাক করা যে, আগে থেকে এত আইন থাকা সত্ত্বেও ট্রান্সজেন্ডার আইনটি পাশ হয়ে গেল।

এটাই শেষ না। ট্রান্সজেন্ডার আইন শুধু সমকামিতার বৈধতাই দেবে, তা নয়। ট্রান্সজেন্ডার আইনের ধারা ৪-এর অধীনে বলা হয়েছে, "ট্রান্সজেন্ডারদের বিরুদ্ধে সব ধরনের বৈষম্য নিষিদ্ধ। চাকরি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবা, পরিবহন ইত্যাদির ক্ষেত্রে তাদের কোনো ধরনের 'অস্বীকারের' সম্মুখীন করা যাবে না"। তারপর ধারা ৫-এর অধীনে বলা হয়েছে, "এটি সব ধরনের হয়রানিকেও নিষিদ্ধ করে"।

দেখা যাচ্ছে, ট্রান্সজেন্ডারদের অধিকার সে-দেশে সাধারণ জনগণের চেয়েও বেশি।

হিজড়াদের ব্যাপারে অবস্থান

হিজড়াকে তৃতীয় লিঙ্গ বলে স্বীকৃতি দেওয়া কিংবা ট্রান্সজেন্ডারিজম মেনে নেওয়া- সবগুলোই আল্লাহপ্রদত্ত দুই লিঙ্গের বাইরে গিয়ে স্রষ্টাকে চ্যালেঞ্জ করার বিবেচনায় কার্যত এক।

হিজড়া জীবনাচার কেন সমস্যাজনক, তার কিছু পয়েন্ট এখানে উল্লেখ করা হলো-

১. মানুষের খোজাকরণ হারাম (যা অনেক হিজড়া করে।)

২. বিপরীত লিঙ্গের মতো পোশাক পরা ও আচরণ করা হারাম।"

৩. কিছু মানুষের বিশেষ ক্ষমতা আছে এবং তারা মানুষকে আশীর্বাদ বা অভিশপ্ত করতে পারে-এমন বিশ্বাস একপ্রকার শির্ক। (কিছু মানুষ হিজড়াদের ব্যাপারে এমন বিশ্বাস করে)।

অবশ্যই ইসলাম ইন্টারসেক্স বা হিজড়াদের অস্তিত্বকে স্বীকার করে (যারা দুই ধরনের লিঙ্গ বা নিষ্ক্রিয় লিঙ্গ নিয়ে জন্মায়)। উলামায়ে কেরাম এর শারয়ী সমাধান নিয়ে কাজ করেছেন। কিন্তু শরীয়াতে তাদেরকে আলাদা লিঙ্গ বলা হয়নি।

উপমহাদেশের যারা নিজেদের হিজড়া দাবি করেন, তাদের একটা বড়ো সংখ্যক পুরুষ, যাদের কিছু আচরণ নারীর মতো। সাধারণত এদের কাউকে বাসা থেকে বের করে দেওয়া হয় এবং তারা হিজড়াদের সাথে থাকা শুরু করে। তাদের আলাদা কমিউনিটি ও জীবনাচার আছে। তারা নারীর মতো আচরণ করে, নারীর মতো পোশাক পরা শুরু করে। খোজাকরণ, স্তন সৃষ্টি করতে হরমোন গ্রহণ, টেসটিকল ও পুরুষাঙ্গ পুরো কেটে ফেলা ইত্যাদি কাজ করে লিঙ্গ পরিবর্তন করতে। খোজা করা অনেক হিজড়া বলে, তাদের কাছে স্বপ্নে তাদের খোদা এসে খোজা হতে বলে। অনেক মুসলিম হিজড়া বলেছে, এটা আল্লাহর ইচ্ছা।৬০

এই সম্প্রদায়ের সদস্য হওয়ার অংশ হিসেবে হিজড়ারা দীক্ষা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। তাদেরকে সেখানে কোনো গুরুর সাথে যুক্ত করে দেওয়া হয়, যে তরুণ হিজড়াদেরকে নির্দেশনা দেয়। তবে তা মানসিক সমর্থন দেওয়া এবং তাদের সম্প্রদায়ে স্বাগত জানানোর মতো সাধারণ কিছু না। তরুণ হিজড়ারা তাদের উপার্জনের একটি অংশ গুরুর কাছে দিতে বাধ্য থাকে। তাই বোঝাই যাচ্ছে, হিজড়া ও তাদের গুরুর সম্পর্ক খুব একটা ভালো হয় না। আরও বড়ো ব্যাপার হলো, তাদের উপার্জন সাধারণত বিভিন্ন ধরনের কাজ থেকে হয়; যেমন-ভিক্ষাবৃত্তি, অনুষ্ঠানে নাচা, বিয়ে ও শিশুদের স্নানে আশীর্বাদ ও পতিতাবৃত্তি।

কিছু কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস আছে-হিজড়াদের কিছু বিশেষ ক্ষমতা আছে। তাদেরকে ক্ষেপিয়ে দেওয়া দূর্ভাগ্য বয়ে আনে। উদাহরণস্বরূপ, সদ্যপ্রসূত শিশু বা নববিবাহিত দম্পতিকে আশীর্বাদ করার ক্ষেত্রে মনে করা হয়, হিজড়ারা যে-টাকা চায় তা না দিলে

বন্ধ্যাত্বের সমস্যা হয়।” এখানে আমরা দেখছি, একগাদা কুসংস্কার ও আল্লাহর ক্ষমতা মানুষের আছে বলে বিশ্বাস করা, যা স্পষ্ট শির্ক।

লিঙ্গ কেটে যারা হিজড়া হয়, তারা নিজেদের সাথে বা অন্য কোনো পুরুষের সাথে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হয়। যেহেতু তাদেরকে 'তৃতীয়' লিঙ্গ ধরা হয়, তাই তারা ও তাদের যৌনসঙ্গীরা একে সমকামিতা বলে মনে করে না। অনেক লোক নিজের স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও হিজড়াদেরকে প্রেমিকা হিসেবে গ্রহণ করে। কারও লিঙ্গ নিয়ে যে-সন্দেহ, তা সংশোধন না করে মেনে নেওয়ার সাথে সাথে যখন তাদের জীবনাচারকেও গ্রহণ করে নেওয়া হয়-তখন এটা যৌনসম্পর্কের ব্যাপারে ঐতিহ্যগত ধারণাকে ধ্বংস করে।

একজন লিঙ্গ-কেটে-ফেলা হিজড়া ব্যক্তির যৌনসম্পর্ক নিয়ে মন্তব্য হলো- "মেহবিশ জন্ম নিয়েছে পুরুষ হিসেবে, কিন্তু সে নিজেকে এখন নারী দাবি করে। সে সমকামী না। সে মনে করে, সমকামিতা তার ধর্মে নিষিদ্ধ। সে বলেছে, 'আমার বয়ফ্রেন্ড আছে। কোনো গার্লফ্রেন্ড নেই। তার মানে আমি সমকামী না'।"

খুব দুঃখজনক একটি জটিলতা। জেন্ডার নিয়ে এমন বিভ্রান্তি তৈরি হলে হালাল-হারাম নিয়েই বিভ্রান্তি তৈরি হবে। এটাকে আরও জটিল করার কিছু নেই। একজন পুরুষ-সে নপুংসক হলেও-যদি সে নারীর মতো পোশাক পরে ও আচরণ করে এবং অন্য পুরুষের সাথে সমকামী যৌনসম্পর্কে লিপ্ত হয়, তাহলে এটা হলো সবচেয়ে বড়ো ও লজ্জাজনক গুনাহের একটি।

ইসলামের ইতিহাসে নপুংসক: ট্রান্সজেন্ডার জীবনধারার জন্য মিথ্যা যুক্তি

'এটি ঔপনিবেশিক যুগের একটি আইন ছিল' উল্লেখ করার পাশাপাশি কিছু ট্রান্সজেন্ডার অ্যাক্টিভিস্ট আরও বলছে- 'নপুংসকদের যেহেতু দক্ষিণ এশিয়াসহ মানবেতিহাসজুড়ে অস্তিত্ব রয়েছে তাই ট্রান্সজেন্ডারদেরকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।' (যদিও-বা সব ট্রান্সজেন্ডার নপুংসক নয়।)

এ যুক্তি খুব সহজেই খণ্ডন করা সম্ভব। পৃথিবীর ইতিহাসজুড়ে অনেক কিছুই ছিল। মাদকাসক্তি, যিনা, পরকীয়া, সমকামিতা। কিছু থাকা মানেই তা নৈতিক হয়ে যাওয়া না। মূলত এই ধরনের যুক্তিই আমাদের ওপর এই লিবারেল বাস্তবতাকে চাপিয়ে দিয়েছে। এসবের ভিত্তিতেই শিক্ষাবিদ ও কর্মীরা এ-ধরনের জঘন্য আচরণকে ন্যায্যতা দেয়। মূল ধারণাটা হলো- যেহেতু ইতিহাসে কিছু ছিল, তাহলে চলুন তা বোঝার চেষ্টা করি; যেন এটাকে স্বাভাবিক দেখিয়ে বৈধতা দেওয়া যায়। এটাকে "নিরপেক্ষ" পথ বলা হচ্ছে। এভাবেই কিছু অ্যাকাডেমিক ও মুসলিম সেলিব্রেটি এসব জঘন্য আচরণ ও কাজকে মুসলিম-অমুসলিম সকলের কাছে বৈধ করতে চায়।

আসুন, ইসলামের ইতিহাসে নপুংসকদের অস্তিত্বের ধরন সম্পর্কে ধারণা পেতে ইসলামের ইতিহাসের কয়েকটি উদাহরণ দেখি। ইসলামের অন্যতম একটা বিধান হলো, নপুংসকরা গাইরে মাহরাম নারীদেরকে মাহরাম পুরুষের মতোই দেখতে পারবে। তাই ইসলামের ইতিহাসে অনেক সময় এটি তাদের সামাজিক অবস্থানের ওপর কী প্রভাব ফেলে এবং পরবর্তীকালে এ-ধরনের লোকেরা গাইরে মাহরামকে দেখতে পারবে কি না, তা নিয়ে উলামাদের মধ্যে আলোচনা আছে। যেমন, আলোচনা করেছেন অষ্টম শতাব্দীর শাফিয়ী আলিম তাজুদ্দীন আস-সুবকী রহিমাহুল্লাহ। তারা নপুংসক নিয়ে

আলোচনা করেছেন মানে এই না যে, তারা খোজাকরণকে বৈধ বলেছেন। এ-আলোচনাটি দেখা যাক-

"নপুংসকরা হার্মাফ্রোডাইটদের মতো জন্মগত না। তাদেরকে খোজা করা হয়। খোজাকরণের এ-কাজ শরীয়াতে আগেও নিষিদ্ধ ছিল, এখনও নিষিদ্ধ। অন্তত তাত্ত্বিকভাবে ক্রীতদাস ব্যবসায়ীরা যুবক ছেলেদেরকে আমদানি করার আগে ইসলামী রাজ্যের সীমানায় খোজাকরণ করতো। এই ব্যাপারটা উলামায়ে কেরাম ভালোভাবে নিতেন না।

সুবকী রহিমাহুল্লাহ যে-বাক্য দিয়ে তার আলোচনা শেষ করেছেন, তা হানাফী ফিকহের কিতাবে পাওয়া যায়। ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "নপুংসকদেরকে কাজে নেওয়া হারাম না, তবে মাকরুহ। কারণ, নপুংসকদেরকে কাজে লাগানো হলো খোজাকরণকে উৎসাহিত করা। অথচ খোজাকরণ নিষিদ্ধ"।

[নোট :হানাফী ফিকহ মতে, নপুংসকরা পর্দার মাসআলায় স্বাভাবিক পুরুষদের মতো বিবেচিত হবে। অর্থাৎ, গাইরে মাহরাম নারীদেরকে দেখতে পারবে না। মালিকী, শাফিয়ী ও হাম্বালী ফিকহ মতে, 'সম্পূর্ণ কামনাশূন্য' নপুংসকরা মাহরাম পুরুষদের মতো বিবেচিত হবে। অর্থাৎ, দেখাসাক্ষাতের পাশাপাশি প্রয়োজনে তার সাথে সফরও করতে পারবে। উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত তিন ফিকহ মতে নপুংসকদের বিভিন্ন স্তর ও প্রকার রয়েছে। স্তর ও প্রকারভেদে পর্দার মাসয়ালাতেও ভিন্নতা রয়েছে।কোন ফিকহেই সকল নপুংসককের ক্ষেত্রে ‘'নি:শর্ত মাহরাম’ হিসেবে বিবেচিত হওয়ার বিধান নেই। আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যা : ৩/৮;৩৯/৫২।]

ট্রান্সজেন্ডার, জেন্ডার কুইয়ার ও হিজড়াদের একটা অংশ-এগুলো একই ধরনের আচরণের একেক নাম, যা ইসলামে কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। যদিও কারও এ-ধরনের অনুভূতি থাকা খুব বেশি অসম্ভব নয়, কিন্তু নারী বা পুরুষের পরিচয় নিয়ে খেলা করাটা বেশ উদ্ভট।

মহান আল্লাহর নির্ধারিত সীমার লংঘন

দুনিয়াতে মানুষের বংশধারা অব্যাহত রাখা ও বংশ পরিচয় সংরক্ষণ এবং পরিবার ও সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ইসলাম যেসব যুগান্তকারী বিধান দিয়েছে তার মধ্যে একটি হল যিনা-ব্যভিচার থেকে সর্বতোভাবে বেঁচে থাকা। শুধু ব্যভিচার থেকেই নয়; বরং যেসব কাজকর্ম ও আচার-আচরণ মানুষকে ব্যভিচারে প্রলুব্ধ করে এবং মানুষকে ধীরে ধীরে ব্যভিচারের দিকে ধাবিত করে, সেসব থেকেও বেঁচে থাকার আদেশ করা হয়েছে। কুরআন মাজীদের অমোঘ ঘোষণা—

وَ لَا تَقْرَبُوا الزِّنٰۤی اِنَّهٗ کَانَ فَاحِشَةً وَ سَآءَ سَبِیْلًا.

আর তোমরা যিনার নিকটবর্তীও হয়ো না। নিশ্চয়ই এটি অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ। —সূরা বনী ইসরাঈল (১৭) : ৩২

ইমাম ইবনে কাসীর রাহ. আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, বান্দাদের জন্য ব্যভিচার ও এর নিকটবর্তী হওয়াকে নিষিদ্ধ করে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন—

وَ لَا تَقْرَبُوا الزِّنٰۤى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَ سَآءَ سَبِيْلًا.

আর ব্যভিচারের উপকরণ ও উপলক্ষগুলোতে জড়ানোই হল তার নিকটবর্তী হওয়া। —তাফসীরে ইবনে কাসীর ৫/৭২

উক্ত বিধানটি নিশ্চিত করার জন্য যিনা-ব্যভিচারের সকল উপলক্ষগুলোকেও শরীয়তে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যেমন, যিনা-ব্যভিচারের একটি প্রধান উপলক্ষ হল দৃষ্টি। অর্থাৎ কোনো পুরুষ পরনারীকে দেখলে কিংবা কোনো নারী পরপুরুষকে দেখলে তার প্রতি দুর্বলতা তৈরি হতে পারে। মনের অজান্তেই তার প্রতি আকর্ষণ জাগ্রত হতে পারে। যা একসময় ব্যভিচার পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে। তাই পর-নারী পুরুষের পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ ও একে অপরের প্রতি দৃষ্টিপাত করা থেকে বিরত থাকার আদেশ করা হয়েছে। তেমনিভাবে নারীকে পর-পুরুষের সামনে নিজের সৌন্দর্য প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে—

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ، وَ قُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ.

মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। এটাই তাদের জন্য উত্তম। তাদের কৃত কার্যকলাপ সম্পর্কে আল্লাহ নিশ্চয়ই অবগত। আর মুমিন নারীদের বলুন, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি সংযত করে এবং লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। সাধারণত যা প্রকাশ পায় তা ব্যতীত নিজেদের আভরণ প্রদর্শন না করে। আর তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে...। —সূরা নূর (২৪) : ৩০-৩১

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُل فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ.

কোনো পুরুষ অপর পুরুষের সতরের দিকে তাকাবে না এবং কোনো নারী অপর নারীর সতরের দিকে তাকাবে না। কোনো পুরুষ এক কাপড়ের নিচে অপর পুরুষের শরীরের সঙ্গে নিজের শরীর লাগাবে না এবং কোনো নারী এক কাপড়ের নিচে অপর

নারীর শরীরের সঙ্গে নিজের শরীর লাগাবে না। —সহীহ মুসলিম, হাদীস ৩৩৮; জামে তিরমিযী, হাদীস ২৭৯৩

তেমনিভাবে পর-নারী ও পর-পুরুষের সাথে নির্জনে বা একান্তে অবস্থানকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যা ব্যভিচারের দিকে ধাবিত করে। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে—

لاَ يَخْلُوَنّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ.

কোনো পুরুষ যেন অপর নারীর সাথে একান্তে অবস্থান না করে। —সহীহ বুখারী, হাদীস ৩০০৬; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৭৭; জামে তিরমিযী, হাদীস ২১৬৫

এমনকি নারীকে তার মাহরাম পুরুষ ব্যতীত একাকী কিংবা অন্য নারীর সাথে হজে¦র মতো ফরয বিধান পালন করারও অনুমতি দেওয়া হয়নি। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

لَا تَحُجّنّ امْرَأَةٌ إِلّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرمٍ.

মাহরাম ব্যতীত কোনো নারী যেন হজ¦ না করে। —সুনানে দারাকুতনী, হাদীস ২৪৪০

আরো দেখুন, সহীহ বুখারী, হাদীস ৩০০৬

আর সঙ্গত কারণেই সন্তানের বয়স দশ বছর হলে তাদের শয্যা পৃথক করে দেওয়ার আদেশ করা হয়েছে। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে—

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.

তোমাদের সন্তানের বয়স সাত বছর হলে তাদেরকে নামাযের আদেশ করো। আর দশ বছর হলে নামাযের জন্য তাদেরকে প্রহার করো এবং তাদের পরস্পরের শয্যা পৃথক করে দাও। —সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৯৫

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ মানুষের এক স্বভাবজাত প্রকৃতি। নির্দিষ্ট সময়ের পর মানুষের মাঝে এই আকর্ষণ জাগ্রত হয়। পৃথিবীর শুরু থেকে সকল যুগে ও সকল ধর্মে এই প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার বিধান ছিল। সর্বশেষ শরীয়ত ইসলামে যেমন ধর্ষণ-ব্যভিচার হারাম ও নিষিদ্ধ তেমনি পূর্ববর্তী ইহুদি, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, হিন্দুসহ সকল ধর্মেও তা নিষিদ্ধ ছিল। দুনিয়ার সাধারণ রীতি, জ্ঞান-যুক্তি ও বিজ্ঞান সকল বিচারেই তা যথার্থ।

ইসলামী শরীয়ত একদিকে যেমন এই আকর্ষণকে নিয়ন্ত্রিত রাখার আদেশ করে অন্যদিকে তা চরিতার্থ করার জন্যও দিয়েছে সুন্দর ও সুমহান বিধান। একদিকে যেমন ঘোষণা হয়েছে—

مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الجَنَّةَ.

যে তার দুই চোয়াল ও দুই উরুর মধ্যস্থিত অঙ্গের (জিহ্বা ও লজ্জাস্থান) জামানত দেবে, আমি তার জন্য জান্নাতের যামিন হব। —সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৪৭৪

অন্যদিকে ইরশাদ হয়েছে—

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের যাদের বিয়ের সামর্থ্য আছে, সে যেন বিয়ে করে। আর যার বিয়ের সামর্থ্য নেই, সে যেন রোযা রাখে। কেননা, রোযা তার প্রবৃত্তির চাহিদা প্রশমনকারী। —সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০৬৫

বস্তুত শরীয়তের এই একটি বিধান যদি নিশ্চিত করা যায় এবং ব্যভিচার ও এর সকল উপলক্ষ থেকে মানুষ নিজেকে সংযত রাখতে পারে, তাহলে ব্যক্তি-পরিবার ও সমাজ-রাষ্ট্রসহ সর্বত্রই শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করবে। সুখী ও সমৃদ্ধ একটি সমাজ গড়ে উঠবে। পক্ষান্তরে ট্রান্সজেন্ডারবাদ মূলত অবাধ, যথেচ্ছ ও বিকৃত উপায়ে প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার দ্বার উন্মোচন করে। যার ফলে সমাজে সমকামিতা, বেহায়াপনা ও অসামাজিক কর্মকাণ্ডের প্রসার ঘটে। বস্তুত মানুষের স্বভাবজাত প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে রাখার কোনো সুযোগ তো এতে থাকছেই না; বরং যথেচ্ছ প্রবৃত্তি-চারণের সুযোগ তৈরি হয়। তাছাড়া ট্রান্সজেন্ডারবাদে সন্তান ধারণ ও সন্তান লালন-পালনের মতো কোনো বিষয় নেই। এগুলো থেকে বরং নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। ট্রান্সজেন্ডারবাদ শুধু নিজের প্রবৃত্তিকে যথেচ্ছভাবে উপভোগ করতে শেখায়। সন্তান ধারণ ও লালন-পালনের ঝামেলায় জড়াতে উৎসাহিত করে না। এতে করে একদিকে যেমন দুনিয়ায় মানবের বংশধারা ব্যাহত হবে, তেমনি তার বংশবিস্তারও লোপ পাবে। যার দরুন সমাজ, রাষ্ট্র ও গোটা বিশ্বে এক মহাবিপর্যয় তৈরি হবে। অথচ ইসলামী শরীয়তে মানবের বংশ বৃদ্ধিই কাম্য। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে —تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة.

তোমরা অধিক মহব্বতকারী ও অধিক সন্তান জন্মদানকারী নারীকে বিয়ে করো। কেননা, কিয়ামতের দিন তোমাদের নিয়ে অন্যান্য উম্মতের ওপর আধিক্যের গর্ব করব।

—সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৪০২৭; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৩৫৯৪

ট্রান্সজেন্ডারবাদে রয়েছে আল্লাহর সৃষ্টির বিকৃতি

ট্রান্সজেন্ডারবাদের সবচেয়ে জঘন্য ও গর্হিত দিক হল, এতে আল্লাহর সৃষ্টির বিকৃতি ঘটে। অথচ আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে বিকৃতি সাধন সম্পূর্ণ হারাম ও জঘন্যতম কাজ। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

اِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا، اِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلَّاۤ اِنٰثًا وَ اِنْ يَّدْعُوْنَ اِلَّا شَيْطٰنًا مَّرِيْدًا، لَّعَنَهُ اللهُ وَ قَالَ لَاَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا، وَّ لَاُضِلَّنَّهُمْ وَ لَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَ لَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَ لَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ وَ مَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا، يَعِدُهُمْ وَ يُمَنِّيْهِمْ وَ مَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا، اُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ وَ لَا يَجِدُوْنَ عَنْهَا مَحِيْصًا.

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। এটি ব্যতীত যাকে ইচ্ছা সবকিছু ক্ষমা করেন। আর কেউ আল্লাহর সঙ্গে শরীক করলে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়। তাঁর পরিবর্তে তারা দেবীরই পূজা করে এবং বিদ্রোহী শয়তানেরই পূজা করে। আল্লাহ তাকে লানত করেন। আর সে বলে, আমি অবশ্যই তাদের পথভ্রষ্ট করব। তাদের অন্তরে মিথ্যা আশা-ভরসা সৃষ্টি করব এবং তাদেরকে আদেশ করব, ফলে তারা অবশ্যই পশুর কর্ণচ্ছেদ করবে। তাদেরকে আরো আদেশ করব, ফলে তারা অবশ্যই আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবে। আর কেউ আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে স্পষ্টতই ক্ষতিগ্রস্ত। সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং আশা-ভরসা দেয়। আর শয়তান তাদেরকে শুধু প্রবঞ্চনারই প্রতিশ্রুতি দেয়। ওদের বাসস্থান জাহান্নাম

এবং তারা সেখান থেকে পলায়নের কোনো পথ পাবে না। —সূরা নিসা (৪) : ১১৬-১২১

উপসংহার

মুসলিমদের দায়িত্ব আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার তথা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করা এবং সত্যকে স্পষ্ট করা। অনেক পথশিশু মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার কারণে অল্প বয়সে মাদক ব্যবহার করা শুরু করে, অনেকে ব্লেড দিয়ে নিজের শরীরে কাটাকাটি করে। আমরা অবশ্যই এ শিশুদের প্রতি সহানুভূতি অনুভব করি। তাদের সাহায্য করা আমাদের দায়িত। কিন্তু তাই বলে আমরা তাদের মাদক ব্যবহার কিংবা শরীরে এ-ধরনের আচ কাটাকাটি করার অভ্যাসকে স্বাভাবিক হিসেবে মেনে নিতে পারি না। বৈধতা দিতে পারি না। আমরা বলতে পারি না যে, 'এগুলো যার যার ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার। যতক্ষণ অন্য কারও ক্ষতি না হচ্ছে, এ ধরনের আচরণে কোনো সমস্যা নেই।'

ট্রান্সজেন্ডারবাদ ইসলাম ও মুসলমানদের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাসের পরিপন্থী। কেননা সন্তান হওয়া-না হওয়া, সন্তানের ছেলে বা মেয়ে হওয়া একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিয়ন্ত্রণে। এতে কারো কোনো হস্তক্ষেপের সুযোগ নেই। কোনো চিকিৎসা, বিজ্ঞান, ওষুধ-পথ্য কিংবা কোনো ডাক্তার-কবিরাজের এতে কোনো এখতিয়ার নেই। কুরআন মজীদে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ،
اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّ اِنَاثًا وَ يَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ.

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আধিপত্য আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যাসন্তান দান করেন আবার যাকে ইচ্ছা পুত্রসন্তান দান করেন। অথবা দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই। আবার যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। —সূরা শূরা (৪২) : ৪৯-৫০

পক্ষান্তরে ট্রান্সজেন্ডারবাদে যখন তখন ছেলে বা মেয়ে বনে যাওয়ার ধৃষ্টতা দেখানো হয়। যা সৃষ্টির বিকৃতির পাশাপাশি ঈমান বিধ্বংসীও বটে। তাছাড়া ট্রান্সজেন্ডারবাদ প্রতিষ্ঠা পেলে আল্লাহর দেওয়া শরীয়ত ও কুরআন সুন্নাহ্র অসংখ্য বিধানে ব্যাপক পরিবর্তন ও চরম বিকৃতি ঘটবে। এর মাধ্যমে ইসলামের সালাত, হজ¦, বিয়ে, তালাক, ইদ্দত, বংশপরিচয়, পর্দা, সতর, শাহাদাহ (সাক্ষ্যদান), কাযা, ইমামাত (নামাযের ইমামতি), রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া ও মীরাস-উত্তরাধিকারসহ নারী-পুরুষ সংক্রান্ত কুরআন-সুন্নাহ ও ইসলামের বহু বিধানের পরিবর্তন ও বিকৃতি ঘটবে।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সুমতি দান করুন। ট্রান্সজেন্ডারবাদের অসারতা ও এর ভয়াবহতা অনুধাবন করার তাওফীক দান করুন। বিশ্বের গোটা মুসলিম উম্মাহ্কে এর ভয়াল গ্রাস থেকে হেফাযত করুন। আর আমাদের দেশের দায়িত্বশীল মহলকে বিষয়টি গভীরভাবে উপলব্ধি করার তাওফীক দান করুন এবং ট্রান্সজেন্ডারবাদের মতো একটি কুফরি ও অভিশপ্ত মতবাদকে মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া থেকে তাদেরকে বিরত রাখুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন!

রেফারেন্স

১. https://glaad.org/transgender/transfaq/

২.ট্রান্সজেন্ডারিজম মতবাদ এবং বিশ্ব প্রেক্ষাপট, ড. মোহাম্মদ সরোয়ার হোসেন

৩.wikipedia.org

৪.healthline.com

৫.worldpopulationreview.com

৬.মাসিক আককাউসার

৭.বিজ্ঞানপোকা.কম

৮.ট্রান্সজেন্ডার: রংধনু সন্ত্রাস; ড. ইয়াদ কুনাইবী

৯. জন্মগত হিজড়া বনাম ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ; আসিফ আদনান